ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ)-এর নির্দেশিত

সহীহ মাসনূন ওযীফা

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর
(রাহিমাহুল্লাহ)
পি-এইচ. ডি. (রিয়াদ), এম. এ. (রিয়াদ), এম.এম. (ঢাকা)
অধ্যাপক, আল-হাদীস বিভাগ,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ
www.assunnahtrust.com

ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহ)-এর নির্দেশিত

সহীহ মাসনূন ওযীফা

দোয়া ও এজাযত

দরবারে ফুরফুরার মেজ পীর সাহেব মুফতীয়ে আযম আল্লামা

আবূ ইবরাহীম মুহা. উবাইদুল্লাহ সিদ্দীকী

সংকলনে

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

প্রকাশক: উসামা খোন্দকার
গ্রন্থস্বত্ব: আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০
মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
বিক্রয় কেন্দ্র:
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ, মোবাইল: ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল: ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫
ফুরফুরা দরবার শরীফ, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইল: ০১৭৮৮৯৯৯৯২৬
প্রথম প্রকাশ : মুহার্‌রাম ১৪২৮ হিজরী, মাঘ ১৪১৩ হিজরী বঙ্গাব্দ, জানুয়ারী ২০০৭ ঈসায়ী
২য় সংস্করণ: রজব ১৪৩৪ হিজরী, জৈষ্ঠ্য ১৩২০ হিজরী বঙ্গাব্দ, জুন ২০১৩ ঈসায়ী
৩য় সংস্করণ: রজব ১৪৩৮ হিজরী, চৈত্র ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল ২০১৭ ঈসাযী

হাদিয়া ৪০ (চল্লিশ) টাকা মাত্র ।

ISBN: 978-984-90053-2-2

SAHIH MASNUN OZIFA (Authentic Prophetic Daily Works) by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir. Published by As-Sunnah Pablications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300. 3rd eddition April 2017. Price TK 40.00 only.

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য 'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধি। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবন থেকে আমরা দেখতে পাই যে, ফরয ইবাদত পালনের পরে সদাসর্বদা নফল ইবাদত পালনে রত থেকে, বিশেষত সদা সর্বদা জিহ্বা ও অন্তরকে আল্লাহর যিক্‌রে রত রেখে তাঁরা তাযকিয়া ও বেলায়াতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছেন। সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে তাঁদের পালিত এ সকল নফল ইবাদত ও যিক্‌রের মধ্য থেকে কিছু বেছে নিয়ে মাসনূন (সুন্নাত-সম্মত) 'ওযীফা' তৈরি করতে আমাকে নির্দেশ দান করেন আমার মুহতারাম শ্বশুর ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম মুহিউস সুন্নাহ আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দীকী (রাহিমাহুল্লাহু)। বিভিন্ন তরীকার ওযীফা ছাড়াও অনেক প্রকারের ওযীফার বই বাজারে প্রচলিত। তবে সহীহ হাদীসের ভিত্তিতে মাসনূন বা সুন্নাতি ওযীফার বই তেমন পাওয়া যায় না। শুধু ফুরফুরার মুরিদদের জন্যই নয়, আগ্রহী সকল মুসলিম যেন অল্প পরিশ্রম ও সময়ে সহীহ সুন্নাতি ওযীফাগুলো পালন করে বেশি সাওয়াব, বরকত ও বেলায়াতের অধিকারী হতে পারেন সেজন্য তিনি এ ওযীফাগুলো মনোনীত করেন। এ বিষয়ে তিনি 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)' গ্রন্থে তাঁর বাণীতে বলেন:

"কুরআন সুন্নাহর আলোকে আল্লাহর পথে চলে হৃদয়কে জাগতিক লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ থেকে মুক্ত করে আখেরাতমুখী করা ও আল্লাহর প্রেমে ভরে তোলাই তাসাউফ। কুরআন ও সুন্নাহর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন, বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন, হালাল উপার্জন, হারাম বর্জন ও ফরয পালনের পরে নফল ইবাদতের মধ্য থেকে সহজ ও অধিকতর উপকারী কিছু ইবাদত বেছে দিয়ে, প্রয়োজনে ইবাদতে মনোযোগ ও তৃপ্তি অর্জনের জন্য কিছু রিয়াযাত বা অনুশীলন শিখিয়ে আগ্রহী মুসলিম বা মুরীদকে আল্লাহর পথে নিয়ে যাওয়ার পথই হলো "তরীকত"। ..... আমি আমার ওয়ালিদ সাহেব রাহিমাহুল্লাহুর ও তাঁর মাধ্যমে আমার দাদাজী রাহিমাহুল্লাহু ও অন্যান্য সকল বুজুর্গ থেকে যে শিক্ষা পেয়েছি তার সার সংক্ষেপ হলো কুরআন সুন্নাহর বাইরে কোনো তরীকত-তাসাউফ নেই। ইত্তিবায়ে সুন্নাতের বাইরে কোনো ইবাদত, কামালত বা বুজুর্গী নেই। তরীকত অর্থ শুধুমাত্র কিছু যিকির আযকার বা রিয়াযত নয়। ঈমান, আকীদা, আমল ও রিয়াযাতের সমন্বয় হলো তরীকত। আকীদা, তাকওয়া, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আমল অপরিবর্তনীয়। কিন্তু রিয়াযাত, মুজাহাদা, উপকরণ বা অবলম্বনের পরিবর্তন ঘটে ও ঘটাতে হয়। যুগে যুগে যত তরীকত সৃষ্টি হয়েছে সবই এ রিয়াযাত ও নফল ওযীফার পরিবর্তন হেতু। কারণ নফল ইবাদত ও রিয়াযাতের পদ্ধতির মধ্যে কিছু রয়েছে জায়েয আর কিছু সুন্নাত। অনেক সময় প্রয়োজনের জন্য তরীকতের আমল বা রিয়াযাতের মধ্যে কিছু জায়েয বিষয় রয়ে যায়। এগুলোকে ক্রমান্বয়ে সুন্নাত পদ্ধতিতে উত্তরণ করার চেষ্টা করতে হয়। ...

আমি আমার পিতা ও পিতামহের কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আকীদা ও আমলকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছি। তাঁদের রেখে যাওয়া দাওয়াত, ইরশাদ ও সংস্কারের কাজ জোরদার করার চেষ্টা করেছি। আর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে রিয়াযত ও ওযীফার মধ্যে কিছু পরিবর্তন করেছি। তাঁদের শিক্ষার আলোকেই আমাকে এ পরিবর্তন করতে হয়েছে। তাঁরা আমাদের শিখিয়েছেন যে, সুন্নাতের অনুসরণই কামালাতের একমাত্র পথ। তবে কিছু জায়েয বিষয় তারা বিভিন্ন প্রয়োজনে বজায় রেখেছিলেন। আমিও অনেক জায়েয বিষয় বজায় রাখতে বাধ্য হচ্ছি, যদিও সুন্নাতই উত্তম। সাথে সাথে আমি আমার দায়িত্ব ও সাধ্যের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে জায়েযের পরিবর্তে সুন্নাত পদ্ধতি প্রদানের চেষ্টা করছি। যেন মুরীদগণ বেশি সাওয়াব

অর্জন করতে পারেন এবং তাঁদের জন্য কামালাতের পথ আরো সহজ ও নিশ্চিত হয়।"

রাহে বেলায়াত গ্রন্থে দেওয়া তাঁর বাণীতে তিনি বলেন: "সকলের কাছে আমার অনুরোধ যে, যদি আল্লাহর পথের পথিক হতে চান, আল্লাহর নৈকট্য, বেলায়াত, রহমত, বরকত ও নাজাত লাভের আগ্রহ মনে থাকে তাহলে নিম্নে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখুন:

প্রথমত, বিশুদ্ধভাবে তাওহীদ ও রিসালতের উপর ঈমান আনুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের আকীদা বা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যা ইমাম আবু হানীফার (রহ) "ফিকহুল আকবার", ইমাম তাহাবীর (রহ) "আকীদায়ে তাহাবীয়া" ও অন্যান্য প্রাচীন ইমামগণের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে সে অনুসারে নিজেদের আকীদা গঠন করুন। পরবর্তী যুগের বিদ'আত ও বানোয়াট আকীদা বর্জন করুন। সাথে সাথে সকল প্রকার শিরক, কুফর, বিদ'আত ও ইলহাদ থেকে আত্মরক্ষা করুন।

দ্বিতীয়ত, সকল প্রকার হারাম উপার্জন পরিহার করুন। ফরয ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। সকল কবীরা গোনাহ ও হারাম বর্জন করুন। কোনো মানুষ অথবা প্রাণীর হক বা অধিকার নষ্ট করা বা ক্ষতি করা বিষবৎ পরিত্যাগ করুন।

তৃতীয়ত, মনকে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকার, আত্মতৃপ্তি, জাগতিক সম্মান, প্রতিপত্তি বা টাকা-পয়সার লোভ থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখার জন্য সর্বদা সতর্কতার সাথে চেষ্টা করুন। এজন্য সর্বদা আল্লাহর দরবারে তাওফীক চেয়ে কাতরভাবে দু'আ করুন। প্রয়োজন ছাড়া মানুষের সাথে হাসি তামাশা বা গল্পগুজব যথাসম্ভব কম করুন।

চতুর্থত, নফল ইবাদত বেশি বেশি পালনের চেষ্টা করুন। মানুষের সেবা, উপকার ও সাহায্য জাতীয় কাজ যথাসম্ভব বেশি করুন। নফল সালাত যথাসম্ভব বেশি আদায়ের চেষ্টা করবেন। বিশেষত তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও মাগরিবের পরে কিছু নফল সালাত (আওয়াবীন নামে পরিচিত) সর্বদা পালন করবেন।

নফল সিয়াম বেশি পালনের চেষ্টা করুন। বিশেষত প্রত্যেক সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার, প্রত্যেক আরবী মাসের প্রথমে, শেষে এবং ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের সিয়াম নিয়মিত পালন করবেন। এছাড়া আরাফাতের ও আশুরার সিয়াম পালন করবেন। নফল দান বেশি করার চেষ্টা করবেন। দান করতে সক্ষম না হলে মানুষের বেশি বেশি সেবা ও উপকার করবেন, যা আল্লাহর নিকট দান হিসাবে গণ্য হবে। সকলেই কুরআন কারীম তিলাওয়াত শিখে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবেন। সাথে সাথে অর্থ বুঝার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন। তাহাজ্জুদের পরে বা ফজরের পরে নিয়মিত কয়েক পৃষ্টা তিলাওয়াতের অভ্যাস বজায় রাখবেন।...আল্লাহর দরবারে দু'আ করি–তিনি যেন এ ওযীফার দ্বারা সকল যাকিরের পরিপূর্ণ উন্নতি, বরকত ও মর্যাদা প্রদান করেন এবং কবুল করে নেন।"

শাইখ আবুল আনসার সিদ্দিকী (রাহ) 'রাহে বেলায়াত' ও 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)' গ্রন্থদ্বয়ের মধ্য থেকে বাছাই করা যে সকল ওযীফা পালনের জন্য নসীহত করেছিলেন সেগুলো এ পুস্তকে সংকলন করা হলো। মহান আল্লাহর দরবারে আরযি করি, সুন্নাতে নববীর পালনে ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর অতুলনীয় নিরলস প্রচেষ্ট কবুল করে নিন, আমাদের পক্ষ তাঁকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন এবং আমাদেরকেও সুন্নাতে নববীর পালনকারী ও খাদেম হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন!

আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ওযীফার আগে /৭-৩৪

(ক) বেলায়াত, ওসীলা ও ইহসান /৭

(খ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি /১০

(গ) আত্মশুদ্ধি, বেলায়াত ও ইহসানের মাপকাঠি /১১

(ঘ) বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসানের পথ /১২

(ঙ) ইবাদত কবুলের শর্ত /১৩

(চ) ফরয-নফল ইবাদতের পর্যায় ও গুরুত্ব /১৩

(ছ) অবহেলিত কয়েকটি ফরয ও হারাম /১৪

১. শিরক, কুফর ও নিফাক /১৪

২. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-কুফর /১৫

২. বিদ'আত /১৯

৩. পর্দা /২১

৪. সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা /২২

৫. গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা /২২

৬. নামীমাহ বা চোগলখুরী /২৩

৭. ঝগড়া-তর্ক /২৪

(জ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কিছু কর্ম /২৪

প্রথমতঃ বর্জনীয় মানসিক কর্ম /২৪

১. প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আত্মতৃপ্তি /২৪

২. অহঙ্কার /২৫

৩. হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা /২৭

৪. প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ /২৭

৫. অকারণ মানসিক ব্যস্ততা /২৮

দ্বিতীয়তঃ অর্জনীয় মানসিক কর্ম /২৯

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) মহব্বত /২৯

২. সকল মুমিনের প্রতি মহব্বত ও কল্যাণ কামনা /২৯

৩. ধৈর্যধারণ ও সুন্দর আচরণ /৩০

৪. আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ /৩১

৫. কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি /৩২

৬. নির্লোভতা ও আখিরাতমুখিতা /৩৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সাধারণ নেক আমলের ওযীফা /৩৫-৪৫

(ক) ওযীফার পরিচয় ও গুরুত্ব /৩৫

(খ) নামাযের ওযীফা /৩৫

(১) সালাতুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ /৩৭

(২) সালাতুদ্দোহা বা চাশত /৩৯
(৩) মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সালাত (আওয়াবীন) /৪০
(৪) তাহিয়্যাতুল ওযূ /৪১
(৫) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (দুখুলুল মাসজিদ) /৪১
(৬) সালাতুত তাসবীহ /৪১
(৭) সালাতুত তাওবা /৪২
(৮) সালাতুল ইসতিখারা /৪২
(গ) রোযার ওযীফা /৪২
(ঘ) ইলমের ওযীফা /৪২
(ঙ) দাওয়াতের ওযীফা /৪৪
(চ) খিদমাতে খালকের ওযীফা /৪৪
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ যিক্‌রের ওযীফা /৪৬-৭৩
(ক) যিক্‌রের পরিচয় ও গুরুত্ব /৪৬
(খ) সার্বক্ষণিক পালনীয় যিক্‌র-ওযীফা /৪৭
(গ) সময় নির্ধারিত যিক্‌র-ওযীফা /৫২
(১) ফজরের ওযীফা /৫২
(২) যোহরের ওযীফা /৬২
(৩) আসরের ওযীফা /৬২
(৪) মাগরিবের ওযীফা /৬২
(৫) ইশার ওযীফা /৬২
(৬) দরুদের ওযীফা /৬৩
(৭) মুরাকাবা ও মুহাসাবা /৬৩
(৮) শয়নের ওযীফা /৬৫
(৯) ঘুম ভাঙার ওযীফা /৭১
(ঘ) কয়েকটি বরকতময় মাসনূন দুআ /৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ভালবাসা, সাহচর্য ও মাজলিস /৭৪-৮০
(ক) আল্লাহর জন্য ভালবাসা /৭৪
(খ) আল্লাহর জন্য সাহচর্য /৭৫
(গ) যিকরের মাজলিস /৭৫
(ঘ) যিকিরের মাজলিসের যিক্‌র /৭৭
(ঙ) দরবারে ফুরফুরার তালিমী মাহফিল /৭৭

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওযীফার আগে

(ক) বেলায়াত, ওসীলা ও ইহসান

বিলায়াত বা বেলায়াত অর্থ নৈকট্য, বন্ধুত্ব বা অভিভাবকত্ব। 'বেলায়াত' অর্জনকারীকে 'ওলী' অর্থাৎ নিকটবর্তী বা বন্ধু বলা হয়। আল্লাহর বন্ধুত্ব বা বেলায়ত লাভ করা বা আল্লাহর ওলী হওয়া সকল মুমিনের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আর বেলায়াত অর্জনের সুনিশ্চিত ও সহজ পথ, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের পথ।

কুরআন-হাদীস থেকে আমরা জানি, মানুষের জন্য সবচেয়ে সহজ কর্ম আল্লাহর ওলী হওয়া। কারণ: (১) সকল কাজে সফলতার জন্য যোগ্যতার প্রয়োজন। আল্লাহর ওলী হতে কোনো যোগ্যতা লাগে না। তিনি যাকে যতটুকু দিয়েছেন সেটুকুর ভিতরে তাঁকে ডাকলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। বাকপটু মানুষের সুন্দর দুআ-তিলাওয়াতে তিনি যেমন খুশি, একজন মুর্খ বা বোবা মানুষের অস্পষ্ট দুআ-তিলাওয়াতেও তিনি তেমনি খুশি হন। (২) মানুষকে খুশি করা কঠিন, মহান আল্লাহকে খুশি করা খুবই সহজ; বান্দা তাঁর দিকে হেঁটে অগ্রসর হলে তিনি তার দিকে দৌড়ে আসেন। (৩) দুনিয়ার মানুষকে খুশি রাখা কঠিন, কিন্তু মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখা খুবই সহজ। তিনি শতপাপ ও অবাধ্যতার পরেও বান্দার তাওবার জন্য অপেক্ষা করেন। হারানো উটের মালিক উট ফিরে পেয়ে যত খুশি হয় মহান আল্লাহ পাপী বান্দার তাওবায় তার চেয়েও বেশি খুশি হন। (৪) মানুষ মনের কথা জানে না, তাই প্রিয়তম মানুষও সন্দেহ করেন। কিন্তু মহান আল্লাহ মনের কথা জানেন, কাজেই বান্দা সাধ্যমত যতটুকু আমল করে তাতেই আল্লাহ খুশি হন। মানুষের সাথে প্রেমের আনন্দ অপূর্ণ ও ভেজালপূর্ণ। পক্ষান্তরে মহান প্রভুর সাথে প্রেম মানুষের হৃদয়ে আনে নির্ভেজাল, পরিপূর্ণ ও চিরস্থায়ী আনন্দ, যা পার্থিব জীবনের কঠিনতম মুহূর্তেও হৃদয়ের প্রশান্তিকে স্থায়ী করে।

সম্মানিত পাঠক, আল্লাহর বেলায়াত ও প্রেম অর্জন শুধু সহজতম-ই নয়; উপরন্তু তা মানব জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। জীবনের সকল লক্ষ্যেই ব্যর্থতার সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের লক্ষ্যে ব্যর্থতার কোনোই সম্ভাবনা নেই। মুমিন সাধ্যানুসারে ইখলাস ও সুন্নাতের মধ্যে যা-ই করবেন তাতেই তিনি পরিপূর্ণ ফল ও সাওয়াব লাভ করবেন। মুমিন চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও মহান আল্লাহ পূর্ণ সাওয়াব ও নৈকট্য প্রদান করেন।

আল্লাহ বলেন: "জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর ওলীগণের কোনো ভয় নেই এবং তাঁরা চিন্তাগ্রস্তও হবে না- যারা ঈমান এনেছে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে।"[১]

এভাবে আল্লাহ বললেন, আল্লাহর ওলী হওয়ার মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের ভয় ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়। আর ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে এ বেলায়াত অর্জন করতে হয়। ঈমান অর্থ তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি বিশুদ্ধ, শিরক, কুফর ও বিদআত-মুক্ত বিশ্বাস। "তাকওয়া" শব্দের অর্থ আত্মরক্ষা করা। যে কর্ম বা চিন্তা করলে মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কর্ম বা চিন্তা বর্জনের নাম তাকওয়া। মূলত ফরয পালন এবং হারাম ও পাপ বর্জনকে তাকওয়া বলা হয়। এখানে আমরা দেখছি যে, দুটি গুণের মধ্যে ওলীর পরিচয় সীমাবদ্ধ। ঈমান ও তাকওয়া। এ দু'টি গুণ যার মধ্যে যত বেশি ও যত পরিপূর্ণ হবে তিনি বেলায়াতের পথে তত বেশি অগ্রসর ও আল্লাহর তত বেশি ওলী বা প্রিয় বলে বিবেচিত হবেন।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেক মুসলিমই আল্লাহর ওলী। ইমান ও তাকওয়ার গুণ যার মধ্যে যত বেশি থাকবে তিনি তত বেশি ওলী। প্রসিদ্ধ হানাফী ফকীহ ইমাম আবু জা'ফর তাহাবী (৩২১হি) ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মাদ, আবু ইউসূফ (রাহ) ও আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা (বিশ্বাস) বর্ণনা করে বলেন: "সকল মুমিন করুণাময় আল্লাহর ওলী। তাঁদের মধ্য থেকে যে যত বেশি আল্লাহর অনুগত ও কুরআনের অনুসরণকারী সে ততবেশি আল্লাহর নিকট সম্মানিত (ততবেশি বেলায়াতের অধিকারী)।[২]

মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন: "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্র 'তাকওয়া' কর, তাঁর দিকে 'ওয়াসীলাহ' সন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর; আশা করা যায় যে তোমরা সফল হবে।"[৩]

এখানে ঈমানের পরে তিনটি কর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: 'তাকওয়া', 'ওয়াসীলাহ' ও 'জিহাদ'। তাকওয়ার অর্থ আমরা জেনেছি। জিহাদ অর্থ প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম। আল্লাহ্র বিধান পালনের ও প্রচারের সকল প্রচেষ্টাকেই কুরআন-হাদীসে কখনো কখনো 'জিহাদ' বলা হয়েছে। সত্যের দাওয়াত, অন্যায়ের প্রতিবাদ, হজ্জ পালন, আল্লাহ্র আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে। তবে ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ অর্থ "কিতাল" বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। "জিহাদ" সমাজের প্রতি মুমিনের দায়িত্ব। মুমিন সাধ্যমত সত্যের দাওয়াত দিবেন এবং সুযোগ থাকলে রাষ্ট্রীয় জিহাদে অংশ নিবেন।

---

[১] সূরা ইউনূস: ৬২-৬৩।
[২] ইমাম তাহাবী, আল-আকীদাহ (শারহ সহ), পৃ: ৩৫৭-৩৬২।
[৩] সূরা মায়িদা: ৩৫ আয়াত।

"ওসীলাহ" শব্দটি বাংলায় 'মাধ্যম' বা "উপকরণ" অর্থে ব্যবহার করা হয়। তবে আরবী ভাষায় এর অর্থ "নৈকট্য"। আমরা আযানের জাওয়াব-এর মধ্যে বলি: "আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা'। অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ -কে আপনার সর্বোচ্চ নৈকট্য প্রদান করুন। আমরা বুঝতে পারি যে, 'ওয়াসীলা অর্থ 'মাধ্যম' বা 'উপকরণ' হতে পারে না; কারণ মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। সুপ্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (৩১০ হি) বলেন: "তাঁর দিকে ওসীলা সন্ধান কর। এর অর্থ: তাঁর দিকে নৈকট্য সন্ধান কর, অর্থাৎ যে কর্ম করলে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করে।" তিনি অনেক সাহাবী ও তাবিয়ী থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, ওসীলা সন্ধানের অর্থ নেক আমালের মাধ্যমে তাঁর নৈকট অর্জনের চেষ্টা।[৪]

পূর্বের আয়াতের 'তাকওয়া' শব্দটিকেই এ আয়াতে তাকওয়া ও ওসীলাহ দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। তাকওয়া মূলত আত্মরক্ষামূলক কর্ম, অর্থাৎ ফরয-ওয়াজিব কর্ম করা এবং হারাম-মাকরূহ কর্মাদি বর্জন করা। তার অতিরিক্ত আল্লাহ্‌র নৈকট্যমূলক কর্মই মূলত "ওয়াসীলাহ" বলে গণ্য। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বেলায়াতের পথের কর্মকে দুভাগে ভাগ করেছেন: ফরয ও নফল। তিনি বলেন, আল্লাহ বলেন: "যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর সাথে শত্রুতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন বা ওলী হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি ভালবাসি যা আমি ফরয করেছি। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়তের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি।"[৫]

তাকওয়ার মূল বিষয় আল্লাহর নিষেধ বর্জন। এজন্য বেলায়াতের পথে নফল মুস্তাহাব পালনের চেয়ে হারাম-মাকরূহ বর্জনের গুরুত্ব বেশি। এ বিষয়ে মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী বলেন: আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য প্রদানকারী আমলসমূহ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার ফরয কার্যসমূহ, দ্বিতীয় প্রকার নফল কার্যাবলী। নফল আমলসমূহের ফরযের সহিত কোনোই তুলনা হয় না। নামায, রোযা, যাকাত, যিক্‌র, মোরাকাবা ইত্যাদি যে কোনো নফল ইবাদত হউক না কেন এবং তাহা খালেছ বা বিশুদ্ধভাবে প্রতিপালিত হউক না কেন, একটি ফরয

[৪] তাবারী, তাফসীর (জামিউল বায়ান) ৬/২২৬।
[৫] সহীহ বুখারী, কিতাবুর রিকাক, নং ৬৫০২।

ইবাদত তাহার সময় মতো যদি সম্পাদিত হয়, তবে সহস্র বৎসরের উক্তরূপ নফল ইবাদত হইতে তাহা শ্রেষ্ঠতর। বরং ফরয ইবাদতের মধ্যে যে সুন্নাত, নফল ইত্যাদি আছে, অন্য নফলাদির তুলনায় উহারাও উক্ত প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে।... অতএব, মুস্তাহাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মাকরুহ যদিও উহা 'তানজিহী' হয় তাহা হইতে বিরত থাকা যিক্‌র মোরাকাবা ইত্যাদি হইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, মাকরূহে তাহরীমির কথা কী আর বলিব! অবশ্য উক্ত কার্যসমূহ (যিক্‌র মোরাকাবা) যদি উক্ত আমলসমূহের (ফরয, মুস্তাহাব পালন ও সকল মাকরুহ বর্জনের) সহিত একত্রিত করা যায়, তবে তাহার উচ্চ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, অন্যথায় মেহনত বরবাদ।"[৬]

বেলায়াতের এ পর্যায়কে অন্য হাদীসে ইহসান বলা হয়েছে। "ইহসান" অর্থ সৌন্দর্য বা পূর্ণতা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ইহসান এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; কারণ তুমি তাকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।"[৭]

(খ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি

মহান আল্লাহ বারংবার বলেছেন, উম্মাতের 'তাযকিয়া'ই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মূল মিশন এবং 'তাযকিয়ায়ে নাফস'-ই সফলতার মূল। আল্লাহ বলেন: "সে-ই সফলকাম, যে নিজ নফসকে 'তাযকিয়া' (পবিত্র) করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"[৮] আরো বলা হয়েছে: "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে 'যাকাত' (পবিত্রতা) অর্জন করে এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।"[৯] অন্যত্র ঘোষণা হয়েছে: "আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য থেকে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, তিনি আল্লাহর আয়াত তাদের নিকট আবৃত্তি করেন, তাদেরকে 'তাযকিয়া' (পরিশোধন) করেন এবং কিতাব ও প্রজ্ঞা (সুন্নাত) শিক্ষা দেন।"[১০]

'তাযকিয়া'-র ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী বলেন, তাযকিয়া শব্দটি 'যাকাত' থেকে গৃহীত। যাকাত অর্থ পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। এ সকল আয়াতে 'তাযকিয়া' অর্থও পবিত্রতা ও বৃদ্ধি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুমিনগণকে শিরক ও গাইরুল্লাহর ইবাদত থেকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। সাহাবী-তাবিয়ীগণও এভাবেই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন।

---

[৬] মাকতুবাত শরীফ ১/১/ মাকতুব ২৯, পৃষ্ঠা ৫৭-৫৮।
[৭] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৭; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৭-৪০।
[৮] সূরা শামস, ৯-১০।
[৯] সূরা আ'লা, ১৪-১৫ আয়াত।
[১০] সূরা আল-ইমরান, ১৬৪ আয়াত।

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর আনুগত্য, ইখলাস ও নির্ভেজাল তাওহীদের মাধ্যমে তাদের তাযকিয়া করেন। তাবিয়ী ইবনু জুরাইজ বলেন, তিনি তাদেরকে শিরক থেকে পবিত্র করেন।[১১]

কুরআন আত্মার সকল রোগের চিকিৎসা। আল্লাহ বলেন: "হে মানব জাতি, তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে এসেছে উপদেশ এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তার চিকিৎসা।"[১২] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "জেনে রাখ! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিণ্ড রয়েছে, যদি তা সংশোধিত হয় তবে পুরো দেহই সংশোধিত হয় আর যদি তা নষ্ট হয় তবে পুরো দেহই নষ্ট হয়। জেনে রাখ তা অন্তঃকরণ।"[১৩]

(গ) আত্মশুদ্ধি, বেলায়াত ও ইহসানের মাপকাঠি

আমরা দেখলাম, ঈমান ও তাকওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জিত হয়। ঈমান ও তাকওয়ার পূর্ণতার বা আল্লাহর বেলায়াতের সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি রয়েছে, যা দিয়ে আপনি আপনার বেলায়াত মাপতে পারবেন। ঈমানের পূর্ণতার মানদণ্ড সুন্দর আচরন। হাদীসের ভাষায়: 'মুমিনদের মধ্যে সে-ই ঈমানে পূর্ণতম যার আচরণ সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ যে তার স্ত্রী-পরিবারের সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।' আর আমরা দেখলাম যে, তাকওয়া ও ইহসানের মাপকাঠি হলো: মুমিনের হাত, পা, চোখ ইত্যাদি সব আল্লাহর বিধানের অনুগত হওয়া এবং সার্বক্ষণিক আল্লাকে দেখছি বা আল্লাহ দেখছেন বলে অনুভব হওয়া।

সম্মানিত পাঠক, আপনি কি জানতে চান, আপনি বেলায়াত, আত্মশুদ্ধি ও ইহসান অর্জন করতে পেরেছেন কি না? আপনার অবস্থা বিবেচনা করুন:

(ক) আপনি ফরয-নফল ইবাদত বন্দেগি করেন। স্বপ্ন, কাশফ বা হালতও হয়ত লাভ করেন। তবে আপনি মানুষের সাথে দুর্ব্যবহারে অভ্যস্থ। কাউকে আচরণের কষ্ট দিতে আপনার কষ্ট হয় না। মানুষের হক্ক নষ্ট করতে ও অন্যান্য পাপ ও সুন্নাত বিরোধী কাজ করতে আপনার হাত, পা, চোখ, কান বা মন-মগজ আড়ষ্ট হয় না। বিপদে আপদে আপনার হৃদয় অশান্ত হয়ে যায়। আনন্দে ও বিপদে কৃতজ্ঞতা, আকুতি ও আবেদনের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের কথা আপনার হৃদয়ে জাগরুক হয়।

(খ) আপনি সকল মানুষের সাথে ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সুন্দর আচরণে অভ্যস্থ। মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করলে আপনার খুবই কষ্ট হয়। ছোট-বড় যে কোনো পাপের কাজে আপনার হাত, পা, চোখ, কান আড়ষ্ট হয়।

---

[১১] তাবারী, তাফসীরে তাবারী (জামিউল বাইয়ান) ১/৫৫৮।
[১২] সূরা ইউনূস, ৫৭ আয়াত। আরো দেখুন: সূরা বানী ইসরাঈল, ৮২ আয়াত ও সূরা ফুস্‌লিাত ৪৪ আয়াত।
[১৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/২৮; মুসলিম আস-সহীহ ৩/১২১৯।

সর্বদা আপনি অনুভব করেন যে, মহান আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার হৃদয়ের গোপনতম চিন্তা দেখছেন। আনন্দে, কষ্টে, নিয়ামতে ও মুসিবতে সর্বদা আল্লাহর রহমত ও সাহচর্যের অনুভূতি আপনার হৃদয়কে উদ্ভাসিত করে রাখে। উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তা আপনার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করতে পারে না। যে কোনো নিয়ামতে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও যে কোনো কষ্টে শুধু তাঁরই কাছে আকুতির আবেগ আপনার মনকে আলোড়িত করে।

সম্মানিত পাঠক আপনার অবস্থা যদি প্রথম পর্যায়ের হয় তবে আপনি নিশ্চিত হোন যে, আপনি বেলায়াতের সঠিক পথে চলছেন না। সম্ভবত আপনি ভুল পথে বেলায়াত অর্জনের চেষ্টা করছেন। আর যদি আপনি দ্বিতীয় অবস্থা অর্জন করে থাকেন তবে মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন যে, আপনি সত্যিকারের বেলায়াতের পথে চলার তাওফীক পেয়েছেন। সম্ভবত আপনি সঠিক পথে বেলায়াত অর্জনের চেষ্টা করছেন।

(ঘ) বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসানের পথ

তাহলে বেলায়াত অর্জনে সফলতার জন্য সঠিক পথে চলতে হবে। আর বেলায়াত অর্জনের সঠিক পথ মুহাম্মাদ (ﷺ) ও সাহাবীগণের পথ বা ইত্তিবায়ে সুন্নাত। বেলায়াত অর্জনের পরিপূর্ণতম আদর্শ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)। তাঁর আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণ করে 'তাযকিয়া' ও 'বেলায়াতের' সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন তাঁর সহচরগণ। তাঁদের অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মুমিনের বেলায়াতের পূর্ণতা। অনুকরণ-অনুসরণ আংশিক হলে তাযকিয়া ও বেলায়াতের লক্ষ্য অর্জনও আংশিক ও অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

'তাযকিয়া' বা আত্মশুদ্ধিই রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিশন এবং সফলতার মূল বিষয়। তাঁর শরীয়ত ও সুন্নাতই 'তাযকিয়া', আত্মশুদ্ধি ও বেলায়াতের সিলেবাস। শরীয়াত ও সুন্নাতের অতিরিক্ত কোনো বিষয় তাযকিয়া বা বেলায়াতের জন্য জরুরী মনে করার অর্থ তাঁর সুন্নাতকে অপূর্ণ এবং তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের বেলায়াত ও আত্মশুদ্ধিকে অসম্পূর্ণ বলে ধারণা করা!

বস্তুত দীনের সকল কর্মই 'তাযকিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত; কারণ দীনের প্রতিটি কর্মই মুমিনের হৃদয়কে আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে পবিত্র করে এবং তার সাওয়াব, মর্যাদা ও পবিত্রতা বৃদ্ধি করে। শরীয়ত ও সুন্নাতের আলোকেই আত্মশুদ্ধির ফরয ও নফল এবং করণীয় ও বর্জনীয় পর্যায় নির্ধারণ করতে হবে। শিরক, কুফর, আত্মপ্রেম, কুরআন-সুন্নাহের বিপরীতে নিজের পছন্দকে গুরুত্ব প্রদান, হিংসা, অহঙ্কার, লোভ, রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ইত্যাদি থেকে হৃদয়কে মুক্ত ও পবিত্র করতে হবে। এগুলো বর্জনীয় মানসিক কর্ম। মনকে ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ-ভীতি, আল্লাহর

রহমতের আশা, আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্টি, নির্লোভতা, সকলের প্রতি ভালবাসা, কল্যাণ-কামনা ইত্যাদি বিষয় দিয়ে পরিপূর্ণ করতে হবে। এগুলো করণীয় মানসিক কর্ম। এগুলোর ফরয ও নফল পর্যায় আছে। এভাবে আমরা দেখছি যে, শির্ক, আত্মপ্রেম ইত্যাদিতে মন ভরে রেখে পাশাপাশি সবর, শোকর, ক্রন্দন ইত্যাদি গুণ অর্জনের চেষ্টা করা বিভ্রান্তি ও ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই নয়।

(ঙ) ইবাদত কবুলের শর্ত

কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, আল্লাহর দরবারে ইবাদত কবুল বা গৃহীত হওয়ার জন্য তিনটি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

(১). বিশুদ্ধ ঈমান ও ইখলাস: শির্ক, কুফ্‌র ও নিফাক-মুক্ত বিশুদ্ধ ঈমান ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। উপরন্তু ইবাদতটি পরিপূর্ণ ইখলাসের সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো রকম উদ্দেশ্যর সামান্যতম সংমিশ্রণ থাকলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না।

(২). সুন্নাতের অনুসরণ: কর্মটি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত, রীতি ও তাঁর শিক্ষা অনুসারে পালিত হতে হবে। যদি কোনো ইবাদত তাঁর শেখানো ও আচরিত পদ্ধতিতে পালিত না হয়, তাহলে যত ইখলাস ও আন্তরিকতা-ই থাক না কেন তা আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না বা তার কোনো সাওয়াব মিলবে না।

(৩). হালাল ভক্ষণ: ইবাদত পালনকারীকে অবশ্যই হালাল-জীবিকা-নির্ভর হতে হবে। হারাম ভক্ষণকারীর ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না।

(চ) ফরয-নফল ইবাদতের পর্যায় ও গুরুত্ব

ফরযের অতিরিক্ত কর্মকে 'নফল' বলা হয়। কিছু 'নফল' ইবাদত রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়মিত পালন করেছেন বা উৎসাহ দিয়েছেন। এগুলোকে 'সুন্নাত' বলা হয়। উপরের হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, ফরয ইবাদত পালনের পরে সদা-সর্বদা সুন্নাত-নফল ইবাদতে রত থাকাই বেলায়াত, তাযকিয়া ও ইহসানের পথ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের জীবনে আমরা এ আদর্শই দেখতে পাই। ফরয ইবাদত পালনের পরে তাঁরা বেশি বেশি নফল সিয়াম, নফল সালাত, নফল দান, নফল যিক্‌র ও অন্যান্য নফল ইবাদতে সদা-সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। অনেকে তরীকত, তাযকিয়া বা ওযীফার নামে বিভিন্ন নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকেন, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদতে অবহেলা করেন। এভাবে ফরয বাদ দিয়ে নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা ভণ্ডামি অথবা বোকামি। এজন্য বেলায়াত ও তাযকিয়ার পথের কর্মগুলোর পর্যায় বুঝা প্রয়োজন। কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, তাযকিয়া ও বেলায়াতের পথের কর্মগুলোর পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায় নিম্নরূপ:

(১) ঈমানঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলে পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পণ্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

(২) বৈধ উপার্জনঃ মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, জুয়া, ফাঁকি, ধোঁকা, ভেজাল, পরিমাপ বা পরিমানে কম দেওয়া, জুলুম, জোরপূর্বক গ্রহণ ইত্যাদি উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

(৩) বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জনঃ কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয কর্ম দু প্রকার : প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয। এটি "হারাম" নামে অভিহিত। হারাম দু প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার নষ্ট করা বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলো বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

(৫) ফরয কর্মগুলো পালন।

(৬) মাকরুহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

(৭) সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

(৮) ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন

এ সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠককে **'রাহে বেলায়াত'** গ্রন্থটি পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

(ছ) অবহেলিত কয়েকটি ফরয ও হারাম

ফরয ইল্‌ম, আকীদা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হজ্ব, ফরয পোশাক ও পর্দা, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ, অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত (যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য) পালন না করে নফল ইবাদত, নফল যিক্‌র ইত্যাদি পালনে বিশেষ কোনো লাভ হয় না। আমাদের দেশে অনেক মানুষ আল্লাহর পথে চলতে চান এবং অনেক ফরয ও নফল ইবাদত করেন, কিন্তু অসাবধানতা বশত অনেক ফরয ইবাদত তাঁরা পরিত্যাগ করেন। এগুলোর মধ্যে কিছু করণীয় ফরয ও কিছু বর্জনীয় ফরয বা হারাম কর্ম রয়েছে। এখানে এ জাতীয় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি।

১. শিরক, কুফর ও নিফাক

শিরক অর্থ অংশ। আল্লাহর কোনো কর্ম, গুণ, নাম বা ইবাদতে কোনো সৃষ্টিকে অংশীদার বানানো, তাঁর সমকক্ষ মনে করা, কোনো ফিরিশতা, জিন, নবী, ওলী, তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, দ্রব্য বা অন্য কিছুর মধ্যে 'ঈশ্বরত' বা অলৌকক ক্ষমতা আছে বলে মনে করা শিরক। কুফর অর্থ অবিশ্বাস। তাওহীদ ও রিসালাত বিষয়ক ঈমানের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা কুফর। শিরক ও কুফর

পরস্পর জড়িত ও অবিচ্ছেদ্য। মনের মধ্যে শিরক-কুফর গোপন রেখে মুখে ঈমানের দাবী করা নিফাক বা মুনাফিকী।

শিরক ধার্মিকদের পাপ। **ধার্মিক মানুষদের ধ্বংস করতে শয়তানের মূল অস্ত্র ৫টিঃ শিরক, কুফর, বিদআত, হিংসা-বিদ্বেষ ও বান্দার হক্ক নষ্ট করা।** এর মধ্যে প্রথম চারটিকে শয়তান একেবারে ধর্মের লেবাস পরিয়ে পেশ করে। বিশ্বাসী মানুষ ধর্ম পালনের নামেই এ সকল পাপ করেন। কোনো নাস্তিক কখনো শিরকে লিপ্ত হয় না। বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহর করুণা লাভের আবেগে আল্লাহর কোনো সৃষ্টিকে অতিভক্তি করে শিরকে লিপ্ত হন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, কাফিরগণ শুধু আল্লাহর বেলায়াত অর্জনের জন্যই শিরক করত (সূরা ৩৯-যুমার: আয়াত ৩)।

কুরআন-হাদীসের অগণিত বর্ণনায় আমরা দেখি যে, শিরক-কুফর জীবনের ভয়ঙ্করতম পাপ। অন্যান্য পাপ থেকে এর বিশেষত্ব: **(ক)** এর শাস্তি ভয়ঙ্করতম ও কঠিনতম। **(খ)** সকল পাপ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাওবা ছাড়া নিজ করুণায়, নেক আমলের বরকতে বা কারো শাফাআতে ক্ষমা করবেন কিন্তু শিরক-কুফরের পাপ পরিপূর্ণ তাওবা ও শিরক-কুফর বর্জন ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না। **(গ)** শিরক-কুফরের ফলে মানুষের অন্যান্য সকল নেক কর্ম বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন কেউ যদি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, যিক্‌র, দোয়া, সুন্নাত পালন, মানব সেবা ইত্যাদি অগণিত নেক আমল করেন, এরপর তিনি একটি শিরকমূলক কর্ম করেন, তাহলে তার সকল নেক কর্মের সাওয়াব বিনষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহর কাছে তার কিছুই থাকবে না। অন্য কোন পাপের ফলে এভাবে নেককর্ম নষ্ট হয় না। **(ঘ)** শিরক-কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম। তাকে অনন্তকাল জাহান্নামেই থাকতে হবে।

২. সমাজে প্রচলিত কিছু শিরক-কুফর

মুসলিম সমাজে অগণিত মানুষ বিভিন্ন প্রকার শিরক-কুফরীর মধ্যে নিপতিত। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রচলিত কুসংস্কার, ওলী ও বুজুর্গগণ সম্পর্কে অতিভক্তি, তাদের কারামতকে তাঁদের নিজস্ব ক্ষমতা বলে মনে করা ইত্যাদি কারণে তাঁরা বহুবিধ শিরক-কুফরে লিপ্ত। এখানে সুস্পষ্ট কিছু শিরক ও কুফরের উল্লেখ করছি:

১. তাওহীদ বা রিসালাতের কোনো বিষয় অবিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস না করা। মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে তাঁর বান্দা, দাস ও মানুষ রূপে বিশ্বাস না করা। তাঁকে আল্লাহর অবতার, আল্লাহ তাঁর সাথে মিশে গিয়েছেন, 'যে আল্লাহ সে-ই রাসূল' ইত্যাদি মনে করা। তাঁকে আল্লাহর নবী ও রাসূল রূপে না মানা। তাকে কোনো বিশেষ যুগ, জাতি বা দেশের নবী মনে করা। তাঁর কোনো কথা বা শিক্ষাকে ভুল, সেকেলে বা আগের যুগের জন্য বলে মনে করা। আল্লাহর

নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁর শিক্ষার অতিরিক্ত কোনো শিক্ষা, মত বা পথ আছে, থাকতে পারে বা প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে করা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এ বিশ্বের প্রতিপালন বা পরিচালনায় শরীক আছেন বলে বিশ্বাস করা। অন্য কোনো সৃষ্টি, প্রাণী, ফিরিশতা, জীবিত বা মৃত মানুষ, নবী, ওলী সৃষ্টি, পরিচালনা, অদৃশ্য জ্ঞান, অদৃশ্য সাহায্য, রিযিক দান, জীবন দান, সুস্থতা বা রোগব্যাধি দান, বৃষ্টি দান, বরকত দান, অনাবৃষ্টি প্রদান, অমঙ্গল প্রদান ইত্যাদি কোনো প্রকার কল্যাণ বা অকল্যাণের কোনো ক্ষমতা রাখেন বা আল্লাহ কাউকে অনুরূপ ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন বলে বিশ্বাস করা।

৩. আল্লাহ ছাড়া কোনো নবী, ওলী, জিন বা ফিরিশতা সকল প্রকার অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী, গায়েব বা দূরের ডাক শুনতে পারেন, সাড়া দিতে পারেন, সর্বত্র বিরাজমান বা হাজির-নাযির বলে বিশ্বাস করা।

৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ, ঈসা (আ) বা অন্য কাউকে আল্লাহর যাত (সত্তা) বা সিফাত (বিশেষণ)-এর অংশ, আল্লাহর সত্তা, বিশেষণ বা নূর থেকে (Same Substance/ Light from Light) সৃষ্ট বা জন্মদেওয়া (begotten) বলে বিশ্বাস করা।

৫. অশুভ বা অযাত্রা বিশ্বাস করা। কোনো বস্তু, প্রাণী, কর্ম, বার, তিথি, মাস ইত্যাদিকে অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রা বলে মনে করা স্পষ্ট শিরক। আমাদের দেশে অনেক মুসলিমও 'কী করলে কী হয়' জাতীয় অনেক বিষয় লিখেন বা বিশ্বাস করেন। এগুলো সবই শিরক। জন্মদিনে নখ-চুল কাটা, ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখা, রাতে নখ কাটা, পিছন থেকে ডাকা, কাক ডাকা ইত্যাদি অগণিত বিষয়কে অমঙ্গল বা অশুভ মনে করা হয়, যা নিতান্তই কুসংস্কার, মিথ্যা ও শিরকী বিশ্বাস। পাপে অমঙ্গল ও পুণ্যে কল্যাণ। সৃষ্টির সেবায় সকল মঙ্গল নিহিত ও সৃষ্টির ক্ষতি করা বা অধিকার নষ্ট করার মধ্যে নিহিত সকল অমঙ্গল। এছাড়া অমঙ্গল বা অশুভ বলে কিছুই নেই।

৬. আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করা। আল্লাহ ছাড়া কোনো দৃশ্য বা অদৃশ্য, জীবিত বা মৃত প্রাণী বা বস্তুকে; যেমন মানুষ, জিন, ফিরিশতা, মাজার, কবর, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে সাজদা করা, অলৌকিক সাহায্য, ত্রাণ, দীর্ঘায়ূ, রোগমুক্তি, বিপদমুক্তি, সন্তান ইত্যাদি প্রার্থনা করা। তাদের নামে মানত, কুরবানি বা উৎসর্গ (sacrifice) করা শিরক। আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য- জীবিত বা মৃত, বিমূর্ত, মূর্ত, প্রস্তরায়িত বা সমাধিত, নবী, ওলী, ফিরিশতা বা যে কোনো নামে বা প্রকারে কারো জন্য- এগুলো করা হলে তা শিরক। মূর্তিতে ভক্তিভরে ফুলদান, মূর্তির সামনে নীরবে বা ভক্তিভরে দাঁড়ানো ইত্যাদি এজাতীয় শিরক বা শিরকতুল্য কর্ম।

৭. আল্লাহর জন্য কোনো ইবাদত করে সে ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো সম্মান প্রদর্শন বা সন্তুষ্টি কামনাও শিরক। যেমন আল্লাহর জন্য

সাজদা করা তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে সামনে রেখে সাজদা করা, যেন আল্লাহর সাজদার সাথে সাথে তাকেও সম্মান করা হয়ে যায়। অথবা আল্লাহর জন্য মানত করে কোনো জীবিত বা মৃত ওলী, ফিরিশতা, জিন, কবর, মাজার, পাথর, গাছ ইত্যাদিকে মানতের সাথে সংযুক্ত করা।

৮. আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ বা তাঁর দ্বীনের মৌলিক কোনো বিষয় অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা, অবজ্ঞা করা বা অপছন্দ করা কুফর। এ জাতীয় প্রচলিত কুফরীর মধ্যে অন্যতম বিষয় আল্লাহর বিভিন্ন বিধান, যেমন নামায, পর্দা, বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, ইসলামী আইন ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ বা এগুলোকে বর্তমানে অচল বা মধ্যযুগীয় মনে করা।

৯. ইসলামকে শুধু ব্যক্তি জীবনে পালন করতে হবে এবং সমাজ, বিচার, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইসলাম চলবে না বলে মনে করা, ইসলামের কোনো বিধান বা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করা, ওয়াজ মাহফিল, যিক্‌র, তিলাওয়াত, নামায, মাদ্রাসা, মসজিদ, বোরকা, পর্দা ইত্যাদির প্রতি অবজ্ঞা বা ঘৃণা অনুভব করা, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবী-রাসূলের প্রতি সামান্যতম অবজ্ঞা প্রকাশ করা।

১০. মুহাম্মাদ ﷺ-এর সর্বশেষ নবী হওয়ার বিষয়ে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করা, তাঁর পরে কারো কাছে কোনো প্রকার নুবুওয়াত বা ওহী এসেছে বা আসা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা।

১১. সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারকি, রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শেখানো নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি, নীতি, আদর্শ, আইন ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোনো নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা আদর্শ বেশী কার্যকর, উপকারী বা উপযোগী বলে মনে করা। যুগের প্রয়োজনে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন বলে মনে করা।

১২. যে কোনো প্রকার কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। উপরে বর্ণিত কোনো কুফুর বা শিরকে লিপ্ত মানুষকে মুসলিম মনে করা বা তাঁদের আকীদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকাও কুফরী। যেমন যারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ নবী বলে মানেন না, তাঁর পরে কোনো নবী থাকতে পারে বা ওহী আসতে পারে বলে বিশ্বাস করেন তাদেরকে কাফির মনে না করা কুফরী। অনুরূপভাবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মকে সঠিক বা পারলৌকিক মুক্তির মাধ্যম বলে মনে করা, সব ধর্মই ঠিক মনে করা কুফর। অন্যান্য ধর্মের শিরক বা কুফরমূলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, সেগুলোর প্রতি মনের মধ্যে ঘৃণাবোধ না থাকা, অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা, তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা, ক্রিসমাস (বড়দিন), পূজা ইত্যাদিতে আনন্দ- উদ্‌যাপন করা ইত্যাদি

বর্তমান যুগে অতি প্রচলিত কুফরী কর্ম ও বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামই সর্বপ্রথম সকল ধর্মের অনুসারীদের ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রত্যেকেই তাদের ধর্ম পালন করবেন। তাদের ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা নিষিদ্ধ। তবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মুক্তি একমাত্র ইসলামের মধ্যে বলে বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল ধর্মই সঠিক বলার অর্থ সকল ধর্মকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করা এবং সকল ধর্মকে অবিশ্বাস করা; কারণ প্রত্যেক ধর্মেই অন্য ধর্মকে বেঠিক বলা হয়েছে।

১৩. আরেকটি প্রচলিত কুফরী ভাগ্যগণনা, ভবিষ্যৎ গণনা বা গোপন জ্ঞান দাবি করা। গণক, জ্যোতিষী, হস্তরেখাবিদ, রাশিবিদ, জটা ফকির ইত্যাদির ভাগ্য কথন বা গাইবী সংবাদে বিশ্বাস করা। এ ধরনের কোনো কোনো কর্ম ইসলামের নামেও করা হয়, যেমন 'এলেম দ্বারা চোর ধরা'। যে নামে ও যে পদ্ধতিতেই করা হোক গোপন তথ্য, গায়েব, অদৃশ্য, ভবিষ্যৎ বা ভাগ্য গণনা বা বলা কুফরী কর্ম। অনুরূপভাবে কোনো দ্রব্য, পাথর, ধাতু, অষ্টধাতু, আংটি, গ্রহ বা এ জাতীয় কোনো কিছু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা দৈহিক বা মানসিক ভালমন্দ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা শিরক।

১৪. রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো কোনো কর্ম, পোষাক, আইন, বিধান, রীতি, সুন্নাত, কর্মপদ্ধতি বা ইবাদত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা।

১৫. কোনো মানুষকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরীয়তের উর্ধ্বে মনে করা কিংবা কোনো কোনো মানুষের জন্য শরীয়তের বিধান পালন করা জরুরী নয় বলে বিশ্বাস করা কুফরী। যেমন, মারিফাত অর্জন হলে অথবা বিশেষ মাকামে পৌঁছালে শরীয়ত পালন করা লাগবে না বলে মনে করা। অনুরূপভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন, পর্দা ইত্যাদি শরীয়তের যে সকল বিধান প্রকাশ্যে পালন করা ফরয তা কারো জন্য গোপনে পালন করা চলে বলে বিশ্বাস করাও কুফরী। এ ধরণের মত পোষণ কারী মূলত নিজেকে বা নিজের ধারণার উক্ত বুজুর্গকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণের চেয়েও বড় বুজুর্গ মনে করে। এ ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হবেন, যদিও তিনি ইসলামের বিধান পালন করেন।

১৬. যাদু, টোনা, বান ইত্যাদি ব্যবহার করা বা শিক্ষা করা।

১৭. ইসলাম ধর্ম জানতে-বুঝতে আগ্রহ না থাকা। ইসলামকে জানা ও শিক্ষা করাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে না করা বা এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া।

১৮. আল্লাহ ও বান্দার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ আছে বা মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর নিকট ক্ষমালাভ, করুণালাভ বা মুক্তিলাভ সম্ভব নয় বলে বিশ্বাস করা শিরক।

২. বিদ'আত

যে কর্ম বা বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবী-তাবিয়ীগণ দীন বা ইবাদত হিসেবে পালন করেননি তাকে দীন, ইবাদত বা সাওয়াবের কর্ম বলে মনে করা বিদ'আত। বিদআতের বৈশিষ্ট্য ও ক্ষতি নিম্নরূপ:

(ক) বিদআত একান্তই ধার্মিকদের পাপ। ধার্মিক ছাড়া কেউ বিদআতে লিপ্ত হয় না। বিদআতই একমাত্র পাপ যা মানুষ পুণ্য মনে করে পালন করে।

(খ) কোনো কর্ম বিদআত বলে গণ্য হওয়ার শর্ত তাকে ইবাদত মনে করা। যেমন একজন মানুষ দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নর্তন-কুর্দন করে যিকর বা দরুদ-সালাম পড়ছেন। এরূপ দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন শরীয়তে মূলত নিষিদ্ধ নয়। কেউ যদি জাগতিক কারণে এরূপ করেন তা পাপ নয়। দাঁড়ানো বা নর্তন কুর্দনের সময় যিকর বা দরুদ-সালাম পাঠ পাপ নয়। দরুদ-সালাম বা যিকরের সময় কোনো কারণে বা অনিয়ন্ত্রিত আবেগে দাঁড়ানো বা লাফানো পাপ নয়। কিন্তু যখন কেউ 'দাঁড়ানো', 'লাফানো' বা 'নর্তন-কুর্দন'-কে দীন, ইবাদত বা ইবাদতের অংশ হিসেবে বিশ্বাস করেন তখন তা বিদআতে পরিণত হয়।

ইবাদত মনে করার অর্থ: **(১)** যিকর বা দরুদ-সালাম দাঁড়ানো বা লাফানো ব্যতিরেকে পালন করার চেয়ে দাঁড়ানো বা লাফানো-সহ পালন করা উত্তম, অধিক আদব, অধিক সাওয়াব বা অধিক বরকত বলে মনে করা বা (২) দাঁড়ানো বা লাফানো ছাড়া যিকর বা দরুদ-সালাম পালন করতে অস্বস্তি অনুভব করার কারণে এপদ্ধতিতে এ সকল ইবাদত পালনকে রীতিতে পরিণত কর।

(গ) আমরা দেখছি যে, সাধারণভাবে বিদআতকে পাপ বলে বুঝা যায় না; কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মটি ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। তাকে ইবাদত বানানো বা ইবাদত বলে বিশ্বাস করাই পাপ। অনেক সময় শরীয়ত নিষিদ্ধ কর্মও বিদআতে পরিণত হয়। যেমন মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য, আল্লাহ ছাড়া কাউকে সাজদা করা, কবর পাকা করা, কবরে বাতি দেওয়া ইত্যাদি। কেউ যদি সাধারণভাবে মদপান, ব্যভিচার, গানবাদ্য ইত্যাদি করে তবে তা হারাম। আর যদি কেউ এ সকল কর্মকে ইবাদত বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কর্ম হিসেবে পালন করে তা হারাম ও বিদআত। বাস্তবেও অনেক ফকীর, মারফতী বা সূফী নামধারী ব্যক্তি ধর্ম বা ইবাদতের নামে এ সকল মহাপাপে লিপ্ত হন।

(ঘ) বিদআতের পাপ কয়েকটি পর্যায়ের: **(১)** তা প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ এ কর্ম আল্লাহ কবুল করছেন না এবং এজন্য কোনো সাওয়াব হচ্ছে না। **(২)** তা বিভ্রান্তি। কারণ তিনি জেনে বা না-জেনে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের ইবাদতকে অপূর্ণ বলে মনে করছেন। **(৩)** বিদআত অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক। **(৪)** গানবাদ্য, মদপান, কবর সাজদা ইত্যাদি মহাপাপকে ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করলে তাতে এ সকল মহাপাপের শাস্তি এবং

বিদআতের শাস্তির পাশাপাশি ঈমান বিনষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

(ঙ) বিদআতের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিক তা সুন্নাতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করে। বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বা আহলুস সুন্নাত মনে করেন। যে সুন্নাতগুলো তার বিদআতের প্রতিপক্ষ নয় সেগুলো তিনি পালন বা মহব্বত করেন। তবে তাঁর পালিত বিদআত সংশ্লিষ্ট সুন্নাতকে তিনি গ্রহণ করতে পারেন না।

উপরের উদাহরণটি বিবেচনা করুন। যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পালন করছেন তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বা সাহাবীগণ দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর, দরুদ বা সালাম পালন করেছেন বা করতে উৎসাহ দিয়েছেন বলে তিনি কোথাও দেখেন নি। তিনি স্বীকার করবেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ বসে বসে যিকর, দরুদ ও সালাম পাঠ করতেন বলে তিনি অনেক হাদীস থেকে জেনেছেন। তারপরও তিনি বসে যিকর বা দরুদ-সালাম পালনে অস্বস্তিবোধ করবেন। বিভিন্ন 'দলীল' দিয়ে এ সকল ইবাদত বসে পালনের চেয়ে দাঁড়িয়ে বা নেচে পালন করা উত্তম বলে প্রমাণের চেষ্টা করবেন।

তাঁর বিদআতকে প্রমাণ করতে তিনি অনেক অপ্রাসঙ্গিক দলীল পেশ করবেন এবং সুন্নাত-প্রমাণিত পদ্ধতিকে অবজ্ঞা করতে তিনি বলবেন: 'সবকিছু কি সুন্নাত মত হয়? ফ্যান, মাইক... কত কিছুই তো নতুন। ইবাদতটি একটু নতুন পদ্ধতিকে করলে সমস্যা কী? উপরন্তু সুন্নাতের হুবহু অনুসরণ করে বসেবসে দরুদ, সালাম ও যিকর পালনকারীর প্রতি কম বা বেশি অবজ্ঞা অনুভব করবেন।

(চ) তাওহীদের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে শিরকের উৎপত্তি এবং রিসালাতের বিশ্বাসের ঘাটতি থেকে বিদআতের উৎপত্তি। বিদআত মূলত মুহাম্মাদ ﷺ-এর রিসালাতের সাথে অন্য কাউকে শরীক করা বা রিসালাতের পূর্ণতায় অনাস্থা। শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন শিরক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'গাইরুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া অন্য)-এর প্রতি হৃদয়ের আস্থা অধিক অনুভব করেন তেমনি বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তি বিদআতের ক্ষেত্রে 'গাইরুন্নবী' (নবী ছাড়া অন্য)-এর অনুসরণ-অনুকরণে অধিক স্বস্তি বোধ করেন। তিনি সর্বদা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'সব কিছু কি নবীর তরীকায় হয়?' বলে এবং নানাবিধ 'দলীল' দিয়ে ইত্তিবায়ে রাসূল ﷺ গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করতে সচেষ্ট থাকেন। পাশাপাশি তার 'বিদআত' আমল বা পদ্ধতিকে উত্তম প্রমাণ করতে 'গাইরুন্নবী' অর্থাৎ বিভিন্ন বুজুর্গের কর্মের প্রমাণ প্রদান করেন।

অনেকেই বলেন: 'আমি শুধু অমুক বুজুর্গকে অনুসরণ করব। অন্য কারো বিষয়ে আমার অভিযোগ নেই। তবে আমি অনুসরণ করব শুধু তাঁকেই। তিনি যা করেছেন তা করব এবং যা করেন নি তা করব না। তিনি জান্নাতে গেলে আমিও যাব। ...।' বর্তমান যুগ থেকে অতীতের যে কোনো 'গাইরুন্নবী' আলিম, ইমাম বা বুজুর্গের নামে এ কথাটি বলা হলে তাতে সাধারণত আপত্তি করা হয় না। কিন্তু যদি

এ কথাটিই মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিষয়ে বলা হয় তবে বিদআতে আক্রান্ত মুমিনগণ তা পছন্দ করবেন না। সকল বিদআতের ক্ষেত্রেই এটি সুস্পষ্ট। মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় অধঃপতন তো আর কিছুই হতে পারে না যে, তাঁর হৃদয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত গ্রহণ করতে অস্বস্তি বা অবজ্ঞা বোধ করে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার বলেছেন: "তাঁর সুন্নাত যে অপছন্দ বা অবজ্ঞা করবে সে তাঁর উম্মাত নয়।"

(জ) অন্যান্য ভয়ঙ্কর পাপ থেকে মুমিন সাধারণত তাওবা করতে পারেন, কিন্তু বিদআত থেকে তাওবা করা খুবই কঠিন। কারণ সকল পাপের ক্ষেত্রে মুমিন জানেন যে তিনি পাপ করছেন; ফলে তাওবার একটি সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বিদআত পালনকারী তার বিদআতকে নেক আমল মনে করেই পালন করেন। কাজেই এর জন্য তাওবার কথা তিনি কল্পনাও করেন না। এজন্য তাবিয়ীগণ বলতেন: কাউকে সাধারণ পাপে লিপ্ত করার চেয়ে বিদআতে লিপ্ত করতে পারলে ইবলীস অনেক বেশি খুশি হয়। সম্ভবত একারণেই বিদআত যত সাধারণই হোক তার প্রতি আকর্ষণ সর্বদা খুবই বেশি হয়। যেমন দাঁড়িয়ে, লাফিয়ে বা নেচে যিকর, দরুদ বা সালাম পালনকারী দাবি করবেন যে, দাঁড়ানো, লাফানো বা নর্তন-কুর্দন মুসতাহাব বা মুসতাহসান; জরুরী নয়। কিন্তু অন্য অনেক ফরয-ওয়াজিব থেকে এর প্রতি তাঁর আকর্ষণ বেশি থাকে। এ থেকে তাওবা তো দূরের কথা এর জন্য তিনি জীবন দিতে প্রস্তুত থাকেন।

(ঝ) বিদআতের অন্য অপরাধ তা সুন্নাত হত্যা করে। সুন্নাত বহির্ভূত কোনো কর্ম বা পদ্ধতি ইবাদতে পরিণত হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট মাসনূন ইবাদত বা পদ্ধতির মৃত্যু। যিনি দাঁড়িয়ে বা লাফিয়ে যিকর বা সালাম পাঠ উত্তম বলে গণ্য করছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের পদ্ধতিতে বসে যিকর বা সালম তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে। সমাজের অন্যান্য মানুষেরা যখন এভাবে দাঁড়িয়ে বা নেচে ইবাদতটি পালন করতে থাকবেন তখন সমাজ থেকেও সুন্নাতটি অপসারিত হবে।

শিরক, কুফর ও বিদআত বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা ও তথ্যসূত্রের জন্য পাঠক আমার লেখা **'এহইয়াউস সুনান'** ও **'ইসলামী আকীদা'** বইদুটো পাঠ করুন।

৩. পর্দা

মানব দেহের কিছু অংশ 'গুপ্তাঙ্গ' বা 'আউরাত' (Private parts) বলে নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। এগুলো অন্য মানুষদের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। পুরুষদের জন্য সদাসর্বদা নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর অন্য মানুষের দৃষ্টি থেকে আবৃত করে রাখা ফরয। এ অংশটুকু স্ত্রী ছাড়া অন্য কাউকে দেখানো হারাম। মহিলাদের পোষাকের মূলত ৪টি স্তর রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন পোষাকের বাধ্যবাধকতা নেই। অন্য মুসলিম মহিলাদের দৃষ্টি থেকে নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থান আবৃত করে রাখা মুসলিম মহিলার জন্য ফরয। পিতা, আপন

চাচা, মামা, ভাতিজা, ভাগিনেয়, শ্বশুর প্রমুখ মাহরাম (বিবাহ সম্ভব নয়) আত্মীয়দের সামনে মোটামুটি কাঁধ থেকে হাঁটু পর্যন্ত শরীর আবৃত করতে হবে। বাকী সকল পুরুষের দৃষ্টি থেকে মুসলিম মহিলা মাথার চুল, মাথা, কাঁধ, কান ও গলাসহ পুরো শরীর আবৃত করে রাখবেন। এগুলো তাদের সামনে অনাবৃত করা হারাম ও কঠিন গোনাহের কারণ। আমরা এতটুকুই বুঝতে পারি যে, যেখানে যতটুকু আবৃত করা ফরয তা আবৃত করলে সাওয়াব হবে এবং অনাবৃত রাখলে কঠিন গোনাহ হবে।

উপরন্তু কোনো মহিলা যদি কব্জি পর্যন্ত হাতের তালু ও মখমণ্ডল ছাড়া অন্য কিছু- যেমন চুল, কান, গলা ইত্যাদি অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করেন, তবে অন্য কোনো মানুষ না দেখলেও তার সালাত আদায় হবে না।

অভিভাবকের জন্য নিজের পর্দা পালন যেমন ফরয, তেমনি নিজের কন্যা, স্ত্রী, ভগ্নি বা নিজের দায়িত্বাধীন সকল মহিলার পর্দা করানো ফরয। আমাদের দেশের অনেক ধার্মিক মুসলিম পুরুষদের সুন্নাতী পোশাকের বিষয়ে সচেতন হলেও মেয়েদের 'সুন্নাতী' তো দূরের কথা, 'ফরয' পোশাকের বিষয়েও সচেতন নন। পুরুষদের সাধারণ পোশাক, সুন্নাতী পোশাক এবং মহিলাদের পর্দা ও সুন্নাতী পোশাকের বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা **'কুরআন সুন্নাহের আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা'** পুস্তকটি পাঠ করতে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

৪. সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট করা

মুমিনের অন্যতম ফরয দায়িত্ব পরিবার ও সমাজের মানুষদের অধিকার আদায় করা। এক্ষেত্রে অবহেলা করা, কারো পাওনা না-দেওয়া বা কারো ক্ষতি করা কঠিন হারামগুলোর অন্যতম। এগুলোর মধ্যে রয়েছে: পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব, আনুগত্য ও সেবার ক্ষেত্রে অবহেলা, সন্তানের প্রতিপালন, ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক ইসলামী শিক্ষা দান ও ইসলামী চরিত্রগঠনের ক্ষেত্রে অবহেলা করা, স্ত্রীর সম্মানজন ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সময় প্রদান ও স্ত্রীর অন্যান্য অধিকার আদায়ে অবহেলা করা, স্বামীর আনুগত্য, সেবা, সংসারের সংরক্ষণ ইত্যাদি দায়িত্বে অবহেলা করা। অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, দুর্বল শ্রেণী, এতিম, দরিদ্র, ক্রেতা, বিক্রেতা, কর্মদাতা, কর্মচারী এবং সকলের প্রতি বিভিন্ন প্রকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে অবহেলা কঠিন কবীরা গোনাহ। এছাড়া এ জাতীয় গোনাহ আল্লাহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা ছাড়া পুরোপুরি ক্ষমা করেন না।

৫. গীবত বা পরনিন্দা করা বা শোনা

অন্য মানুষের অধিকার নষ্টের একটি বিশেষ দিক গীবত। কোনো মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সত্যিকারের দোষত্রুটি- যা তার অনুপস্থিতিতে বললে সে কষ্ট পায়-

তা তার অনুপস্থিতিতে বলা-ই গীবত। যেমন, একজন মানুষ বেটে, রগচটা, অহঙ্কারী, তোতলা, বিলাসী, অল্প শিক্ষিত, স্ত্রী পর্দা করে না, মদখোর, ঘুষখোর, জালিম ... দীনের অমুক কাজে অবহেলা করে ... , ইত্যাদি কোনো দোষ বা দৃষ্টিকটু বিষয় সত্যিই তার মধ্যে রয়েছে। তবে তার পিছনে এর আলোচনায় সে মনোকষ্ট পায়। তার অনুপস্থিতিতে এগুলো উল্লেখ করা গীবত ও কঠিন পাপ। পাপী বা অন্যায়কারী ব্যক্তিকে সরাসরি তার পাপ থেকে নিষেধ করা বা উপদেশ দেওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই ভাল কাজ। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার পাপের বা অন্যায়ের কথা অন্যকে বলা কঠিন কবীরা গোনাহ ও হারাম। গীবত শোনাও একইরূপ পাপ। কারো গীবত করা হলে তার প্রতিবাদ করা মুমিনের দায়িত্ব।

মুমিনের পুণ্য বিনষ্ট করার অন্যতম কারণ গীবত। কুরআনে গীবতকে 'মৃতভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া'-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ পাপের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে অগণিত হাদীসে উম্মতকে সাবধান করেছেন। সবচেয়ে কঠিন বিষয় গীবত করা বান্দার হক্ক সংশ্লিষ্ট পাপ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমা না করলে এ অপরাধের কারণে আমাদের পুণ্য তাকে প্রদান করতে হবে। কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে আলোচনা সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করাই মুমিনের নাজাতের একমাত্র উপায়। আমাদের নিজের গোনাহ ও ভুল-ভ্রান্তির কথা চিন্তা করতে হবে এবং অন্যের কথা চিন্তা করা বা অন্যের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তা করা যথাসাধ্য বর্জন করতে হবে।

৬. নামীমাহ বা চোগলখুরী

একজনের কাছে অনুপস্থিত কারো কোনো দোষত্রুটি আলোচনা গীবত। আর যদি এমন বিষয় আলোচনা করা হয় যাতে দু ব্যক্তি মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয় তবে তাকে 'নামীমাহ' বলা হয়। বাংলায় কানভাঙ্গানো বা কথা লাগানো। এটি গীবতের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ ও জঘন্যতম কবীরা গোনাহের একটি। সত্য কথা লাগানোও নামীমাহ, যেমন সত্য দোষ বলা গীবত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "চোগলখোর বা কানভাঙ্গানিতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৪]

মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য মিথ্যা কথা বলা জায়েয, কিন্তু সম্পর্ক নষ্টকারী সত্য কথা জায়েয নয়। গীবত ও নামীমাহতে লিপ্ত মানুষদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। যদি কেউ আপনার কাছে এসে আপনার কারো সম্পর্কে এধরনের কথা বলে তাহলে তাকে থামিয়ে দিন। এ লোকটি চোগলখোর। সে সত্যবাদী হলেও আপনার শত্রু। আপনার হৃদয়ের প্রশান্তি ও সম্পর্ক নষ্ট করতে চায়। সর্বোপরি, আপনি নিশ্চিত হোন যে, এ ব্যক্তি অন্যের কাছে ঠিক এভাবেই আপনার গীবত-কানভাঙ্গানি করে। আল্লাহ আমাদেরকে চোগলখোরী ও চোগলখোর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

---

[১৪] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২২৫০; মুসলিম, আস-সহীহ ১/১০১।

৭. ঝগড়া-তর্ক

আল্লাহর পথের পথিক বা ধার্মিক মানুষদের জন্য শয়তানের একটি ফাঁদ ঝগড়া ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়া। আমাদের সর্বদা চেষ্টা করতে হবে বিতর্ক এড়িয়ে চলার। একান্তই বাধ্য হলে আমরা আলোচনায় লিপ্ত হব, কিন্তু ঝগড়ায় লিপ্ত হব না। কোনো আলোচনা বিতর্কে রূপান্তরিত হচ্ছে মনে হলে সংঙ্গে সঙ্গে 'রণেভঙ্গ' দিয়ে বলবেন: ভাই আমি তর্ক করতে চাচ্ছি না। আল্লাহই ভাল জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "নিজের মত বাতিল হওয়ার কারণে যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের পাদদেশে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের মত সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিতর্ক পরিত্যাগ করবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে। আর যার আচরণ সুন্দর ও অমায়িক তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে বাড়ি নির্মাণ করা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[১৫]

(জ) তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কিছু কর্ম

আমরা দেখেছি, অন্তরের পরিশুদ্ধি বা তাযকিয়ায়ে নাফ্স ইসলামের মূল নির্দেশনা। বিভিন্ন দৈহিক ইবাদত এ পরিশুদ্ধি অর্জনের পথে সহায়ক। তবে মানসিক কর্মের গুরুত্ব এক্ষেত্রে বেশি। মানসিক কর্মের সাওয়াব ও গোনাহ যেমন অনেক বেশি, তেমনি আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে তার প্রভাবও বেশি।

প্রথমত: বর্জনীয় মানসিক কর্ম

দৈহিক ইবাদতের মত মানসিক ইবাদতেরও বর্জনীয় ও করণীয় দুটি দিক রয়েছে। অনেক সময় আল্লাহর পথে চলতে সচেষ্ট ধার্মিক মানুষ দৈহিক হারাম থেকে সতর্ক থাকলেও মানসিক হারাম থেকে সতর্ক হতে পারেন না। তাঁরা ব্যভিচার, মিথ্যা, মদপান, সালাত বা সিয়াম পরিত্যাগ ইত্যাদি পাপে কখনোই লিপ্ত হন না। কখনো এরূপ কিছু করলে সকাতরে তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকেন। কিন্তু জেনে অথবা না জেনে তাঁরা বিভিন্ন মানসিক পাপের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

অন্তরের পাপ নেককার মানুষের নেক-আমল নষ্ট করে দেয়, অথচ সেগুলোকে অনুধাবন করা অনেক সময় ধার্মিক মানুষের জন্যও কষ্টকর হয়ে যায়। আমরা এখানে সংক্ষেপে এ জাতীয় কিছু পাপের কথা আলোচনা করতে চাই।

১. প্রবৃত্তির অনুসরণ ও আত্মতৃপ্তি

আরবী হাওয়া (الهوى) অর্থ 'প্রবৃত্তি', 'মন-মর্জি' বা ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ। অন্তরের ব্যাধিসমূহের অন্যতম 'প্রবৃত্তি' বা নিজের পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ ও আনুগত্য। ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পন করা। তবে নিজের ইচ্ছামত নয়, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হুবহু অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পন করাই ইসলাম। ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবৃত্তির

[১৫] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১৩২।

অনুসরণের অর্থ বিশ্বাস বা কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ বা তাঁর রাসূলের (ﷺ) কোনো নির্দেশ, শিক্ষা বা সুন্নাত অবগত হওয়ার পরে কোনো যুক্তি, তর্ক বা অন্য কোনো অজুহাতে তা পরিত্যাগ করা বা ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেওয়া। মুমিনের নাজাতের একমাত্র উপায় যে, নিজের মন-মর্জিকে সুন্নাতের অনুগত করে নেওয়া। কুরআন বা হাদীসের কোনো নির্দেশ বা শিক্ষা যদি নিজের পছন্দের বাইরে হয়, অথবা নিজের বা সমাজের প্রচলিত কর্মের বিপরীত হয়, তবে নিজের রুচি পরিবর্তন করে তাকে সুন্নাতের অনুগত করতে হবে। বিভিন্ন অজুহাতে সুন্নাত পরিত্যাগের প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। আল্লাহ বলেন: "আপনি কি তাকে দেখেছেন যে তার নিজের পছন্দ অপছন্দ বা নিজের নফসের খাহেশাতকে নিজের মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে ? আপনি কি তার উকিল হবেন?"[১৬] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : "তার চেয়ে বেশি বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়েত ব্যতিরেকে নিজের প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার অনুসরণ করে? নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদায়েত প্রদান করেন না।"[১৭]

প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি বিশেষ দিক নিজের মত বা কর্মের প্রতি পরিতৃপ্ত থাকা বা নিজেকে নির্ভুল ও ভাল মনে করা। মুমিনের দায়িত্ব নিজের ভুল হতে পারে বলে সর্বদা খেয়াল রাখা এবং কখনোই নিজেকে 'ঈমানে-আমলে' ভাল বলে তৃপ্ত না হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় মানুষকে ধ্বংস করে: অপ্রতিরোধ্য লোভ-কৃপণতা, নিজ প্রবৃত্তির ভালোলাগা মন্দলাগার আনুগত্য, মানুষের তার নিজ বিষয়ে পরিতৃপ্তি।"[১৮]

২. অহঙ্কার

নিজেকে অন্য কোনো মানুষ থেকে কোনো দিক থেকে উন্নত, উত্তম বা বড় মনে করা অথবা কাউকে কোনোভাবে নিজের চেয়ে হেয় মনে করাই কিবর, তাকাব্বুর বা অহঙ্কার। এটি মূলত একটি মানসিক অনুভূতি, তবে কর্মের মধ্যে অনেকসময় তার কিছু প্রভাব থাকে। অহঙ্কার একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর অধিকার। মানুষের জন্য অহঙ্কার করা মূলত মহান আল্লাহর অধিকারে হস্তক্ষেপ। কারণ, আল্লাহর দয়ার ভিক্ষাকে নিজের অর্জন ভেবে অহঙ্কার করা হয়।

পৃথিবীর সকল নিয়ামত আল্লাহ সবাইকে সমানভাবে প্রদান করেন না। কাউকে দেন, কাউকে দেন না অথবা কমবেশি প্রদান করেন। যিনি নিয়ামত পেয়েছেন তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। কিন্তু যদি তিনি এ নিয়ামতকে আল্লাহর দয়ার দান বা ভিক্ষা হিসাবে গ্রহণ না করে নিজের যোগ্যতা, উপার্জন ও

---

[১৬] সূরা ফুরকান, ৪৩ আয়াত।
[১৭] সূরা আল-কাসাস, ৫০ আয়াত।
[১৮] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/২৩০, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৯৭।

সম্পদ মনে করেন তখনই অহঙ্কারের শুরু হয়। এতে প্রথমেই আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

অহঙ্কার সকল ক্ষেত্রেই ধ্বংসাত্মক অনুভূতি। তবে তা যদি ইবাদত কেন্দ্রিক হয় তবে তা আরো বেশি ক্ষতিকারক। নিজেকে ভালো দীনদার মনে করা শয়তানের অন্যতম চক্রান্ত। পাশাপাশি যদি নিজেকে অন্য কোনো মুসলমানের চেয়ে বেশি দীনদার মনে করা হয় তাহলে ধ্বংসের ষোলকলা পূর্ণ হয়।

মুহতারাম পাঠক, কিয়ামতের হিসাব নিকাশ শেষে জান্নাতে প্রবেশের আগে কখনো কোনো মুমিন নিজের নাজাত সম্পর্কেই নিশ্চিত হতে পারে না, নিজেকে অন্য কারো চেয়ে উত্তম বা বেশি ধার্মিক ভাবা তো দূরের কথা! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহঙ্কার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১৯]

অহঙ্কার অন্তরের কর্ম হওয়ার কারণে আমরা সহজে তা ধরতে পারি না। আমরা মনে করি যে, আমার মধ্যে অহঙ্কার নেই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। বিভিন্নভাবে তা যাচাই করা যায়। অতি সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় মানুষের মধ্যে বেরোতে কি আপনার লজ্জা বোধ হয়? এরূপ পোশাক পরিহিত অবস্থায় যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আপনাকে দেখে ফেলেন তবে কি খুব সংকোচ বোধ হয়? যদি হয় তবে বুঝতে হবে যে, মনের মধ্যে অহঙ্কার বিদ্যমান। কোনো সমাবেশ বা মাজলিসে পিছনে বা নিচে বসতে হলে কি আপনার খারাপ লাগে? মনের মধ্যে কি আশা হয় যে, কেউ আপনাকে ডেকে সম্মান করুক, আগে সালাম দিক? যদি হয় তবে বুঝবেন যে, অহঙ্কার অন্তরে লুকিয়ে রয়েছে।

অন্তরের মধ্যে অহঙ্কারের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য মুমিনকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। যে সকল কর্ম করলে 'ছোট' হয়ে যাব বলে মনে হয়, সেগুলো মাঝে মাঝে করতে হবে। যেমন নিম্নমানের পোশাক বা বাহন ব্যবহার করা, নিম্নমানের বাজার করা ইত্যাদি। তাবিয়ী আব্দুল্লাহ ইবনু হানযালা বলেন, সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রা) মাথায় এক বোঝা খড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এ কাজ করছেন? আল্লাহ তো আপনাকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, যাতে এমন না করলেও আপনার চলে? তিনি বলেন, আমি অন্তরের অহংবোধকে আহত করতে চাচ্ছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যার অন্তরে শরিষা পরিমাণ অহঙ্কার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" হাদীসটি হাসান।[২০]

---

[১৯] সহীহ মুসলিম ১/৯৩, নং ৯১।

[২০] হাকিম, আল-মুসতাদরা ৩/৪৭০; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৯৯।

৩. হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা

অহঙ্কারের পাশাপশি মানব হৃদয়ে সবচেয়ে নোংরা ও ক্ষতিকারক কর্ম হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, অমঙ্গল কামনা, পারস্পারিক শত্রুতা, ইত্যাদি। হৃদয়ে এগুলোর উপস্থিতি হৃদয়কে কলুষিত করে, ভারাক্রান্ত করে, আল্লাহর যিক্‌র থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং সর্বোপরি অন্যান্য নেক আমল নষ্ট করে দেয়। হাদীসের আলোকে মুসলমান মুসলমানে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার দুটি ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা জানতে পারি: (১) আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় (২) সকল নেক কর্ম ও ধর্ম ধ্বংস করে দেয়।

অনেক সময় নেককার মানুষেরা অন্যায়ের প্রতি ঘৃণার নামে হিংসার মধ্যে নিপতিত হন। আমাদের দায়িত্ব অন্যায় ও পাপের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। কিন্তু কোনো মুমিনকে এরূপ পাপ বা অন্যায়ের জন্য ঢালাওভাবে ঘৃণা করা যায় না। কারণ মুমিনের মধ্যে বিদ্যমান ঈমান ও অন্যান্য ভাল বিষয়ের জন্য তাকে ভালবাসাও আমাদের দায়িত্ব। পাশাপাশি পাপের জন্য আমাদের মনে বেদনা থাকবে।

ঘৃণা অর্থ হিংসা নয়। ভালবাসার সাথে এ ঘৃণা একত্রিত থাকে। মা তার মলমূত্র জড়ানো শিশুকে দেখে নাক সিটকায় ও তাকে ঘৃণা করে। কিন্তু এ ঘৃণার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে ভালবাসা। মুমিনের প্রতি মুমিনের ভালবাসার অবস্থাও তদ্রূপ। এছাড়া পাপের প্রতি ঘৃণা এবং নিজেকে পাপীর চেয়ে উত্তম মনে করে অহঙ্কার করা এক নয়। সর্বোপরি মুমিন নিজের গোনাহের চিন্তায় ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যস্ত থাকবেন। অন্যের কথা চিন্তা করা থেকে যথা সম্ভব বিরত থাকতে হবে।

৪. প্রদর্শনেচ্ছা ও সম্মানের আগ্রহ

মুমিন তার সকল কর্ম কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করবেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে দেখানোর জন্য বা কারো নিকট থেকে প্রশংসা, সম্মান বা পুরস্কার লাভের জন্য কর্ম করাকে 'রিয়া' বলা হয়। বাংলায় আমরা একে 'প্রদর্শনেচ্ছা' বলতে পারি। মুমিনের সকল ইবাদত ধ্বংস করার ও তাকে জাহান্নামী বানানোর জন্য শয়তানের অন্যতম ফাঁদ 'রিয়া'। কুরআন ও হাদীসে রিয়া বা প্রদর্শনেচ্ছার ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

রিয়া থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুমিনের চেষ্টা করতে হবে যথাসম্ভব সকল নফল ইবাদত গোপনে করা। তবে যে ইবাদত প্রকাশ্যে করাই সুন্নাত-সম্মত তা প্রকাশ্যেই করতে হবে। রিয়ার ভয়ে কোনো নিয়মিত ইবাদত বা প্রকাশ্যে করণীয় ইবাদত বাদ দেওয়া যাবে না। রিয়ার অনুভূতি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। কখনো এসে গেলে বারবার তাওবা করতে হবে এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক প্রার্থনা করতে হবে।

রিয়ার অন্যতম কারণ সমাজের মানুষদের কাছে সম্মান, মর্যাদা বা প্রশংসার আশা। আমাদের খুব ভালভাবে বুঝতে হবে যে, দুনিয়ায় কোনো মানুষই কিছু দিতে পারে না। সকলেই আমার মতই অক্ষম। যে মানুষকে দেখানো জন্য, শোনানোর জন্য, যার প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের জন্য আমি লালায়িত হচ্ছি সে আমার মতই অসহায় মানুষ। আমার কর্ম দেখে সে প্রশংসা নাও করতে পারে। হয়ত তার প্রশংসা শোনার আগেই আমার মৃত্যু হবে। অথবা প্রশংসা করার আগেই তার মৃত্যু হবে। আর সে প্রশংসা বা সম্মান করলেও আমার কিছুই লাভ হবে না। আমার মালিক ও পালনকর্তার পুরস্কারই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি অল্পতেই খুশি হন ও বেশি পুরস্কার দেন। তিনি দিলে কেউ ঠেকাতে পারে না। আর তিনি না দিলে কেউ দিতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে একটি মেষপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে নেকড়েদুটি মেশপালের যে ক্ষতি করবে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দীনের তার চেয়েও বেশি ক্ষতি করে।"[২১]

দুনিয়ার সম্মান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি একটি কঠিন বোঝা ও ফিতনা ছাড়া কিছুই নয়। সম্মান ও প্রতিপত্তিহীন মানুষের অন্তর বিনয় ও সরলতায় ভরা থাকে। ফলে আল্লাহর বেলায়াত অর্জন তাদের জন্য খুবই সহজ হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের অধিকাংশই এরূপ সাধারণ মানুষ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "অনেক মানুষ এমন আছেন যার মাথার চুল এলোমেলো, পদযুগল ধুলিধসরিত, পরণের কাপড় অতি-সাধারণ এবং সমাজে তাদেরকে কোনো গুরত্ব দেওয়া হয় না, কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা এত বেশি যে, যদি তিনি শপথ করে আল্লাহর কাছে কিছু দাবি করেন তবে আল্লাহ তা পূরণ করেন।"[২২]

৫. অকারণ মানসিক ব্যস্ততা

আল্লাহর যিক্‌র মানব হৃদয়ের খাদ্য ও আত্মার পাথেয়। যথাসম্ভব চেষ্টা করবেন সবসময় আল্লাহর রহমত, নিয়ামত, করুণা, বরকত, বিধান, পুরস্কার, শাস্তি, তাঁর প্রশংসা, মর্যাদা, একত্ব ইত্যাদির স্মরণ করে হৃদয়কে পবিত্র, প্রশান্ত ও শক্তিশালী রাখতে। আল্লাহর যিক্‌র থেকে মনকে সরিয়ে রাখে এরূপ বিষয় থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করবেন। যে সকল পত্র পত্রিকা, বই-পুস্তকে ইসলাম, মুসলিম, আলিম-উলামা বা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখা হয় সেগুলো পড়বেন না। অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক, জাতীয়-আন্তর্জাতিক বিষয়াদি নিয়ে অতিরিক্ত মাথা ঘামানো পরিহার করে আল্লাহর কাছে দু'আ ও যিকরে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন।

---

[২১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৮৮। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।
[২২] তিরমিযী, আস-সুনান ৫/৬৯২। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দ্বিতীয়তঃ অর্জনীয় মানসিক কর্ম

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) মহব্বত

আল্লাহর প্রিয় হার্দিক কর্মের অন্যতম 'ভালবাসা'। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে অন্য সকল কিছু এবং নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালবাসতে হবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সকল মুমিনকে ভালবাসতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তিনটি বিষয় যার মধ্যে থাকবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে, প্রথম বিষয় যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল অন্য সকলের চেয়ে তার নিকট বেশি প্রিয় হবেন।"[২৩] তিনি আরো বলেছেন, ''তোমাদের কেউ ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশী ভালবাসবে।''[২৪]

ভালবাসা অর্জনের অন্যতম উপায় সাহচর্য ও অনুকরণ। সাহাবীগণ এভাবেই সত্যিকারের নবীপ্রেম অর্জন করতে পেরেছিলেন। পরবর্তী কালের নবীপ্রেমিকগণ দৈহিক সাহচর্য না পেলেও সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও হাদীস পাঠ, তাঁর ও তাঁর সহচরদের জীবনী পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে তাঁর রুহানী সাহচর্য লাভ করে তাঁর ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁরই হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করে হৃদয়ের মধ্যে এ ভালবাসাকে চিরস্থায়ী ও পরিপূর্ণ করেছিলেন তাঁরা। আমাদেরও এপথে এগোতে হবে।

২. সকল মুমিনের প্রতি মহব্বত ও কল্যাণ কামনা

হৃদয়কে বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যের অমঙ্গল কামনা থেকে মুক্ত রাখা এমন একটি কর্ম যা মানুষকে অতিরিক্ত নফল ইবাদত ও যিক্‌র-আযকার ছাড়াই জান্নাতের অধিকারী করে তোলে। সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, যদি কেউ তার হৃদয় হিংসামুক্ত রাখতে পারে তবে সে জান্নাতী হবে।[২৫] অন্য হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, হিংসামুক্ত হৃদয়ের অধিকারী জান্নাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহচার্য লাভ করবে।[২৬]

পাঠক হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন যে, সংঘাতপূর্ণ জীবনে অনেক মানুষ আমাদেরকে কষ্ট দেন, হক্ব নষ্ট করেন, ক্ষতি করেন বা শত্রুতা করেন। অনেকে অকারণেও এগুলো করেন। এদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে হৃদয়কে কিভাবে বিরত রাখব? আসলে বিষয়টি কঠিন বলেই তো সাওয়াব বেশি। তবে চেষ্টা

---

[২৩] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ১৬, ৬/২৫৪৬; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৬।

[২৪] বুখারী, আস-সহীহ ১/১৪, ৬/২৪৪৫; মুসলিম, আস-সহীহ ১/৬৭।

[২৫] মুসনাদু আহমদ ৩/১৬৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭৮-৭৯, মাকদিসী, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ ৭/১৮৭, ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ ৬/১২১।

[২৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬, নং ২৬৭৮।

করলে তা কঠিন থাকে না। মানবীয় স্বভাবের কারণে আমাদের মনে বিশেষ মুহূর্তে ক্রোধ, কষ্ট বা বিরক্তি আসবেই। তবে মনটা একটু শান্ত হলেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মনের মধ্য থেকে এ অনুভূতি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজের জন্য ও যার কর্মে বা ব্যবহারে আমরা কষ্ট পেয়েছি তার জন্য ইস্তিগফার করতে হবে ও দু'আ করতে হবে।

প্রয়োজনে নিজের হক্ক রক্ষার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবে অধিকার আদায়ের চেষ্টা আর মনের হিংসা ও শত্রুতা এক নয়। এক ব্যক্তি আমার অধিকার নষ্ট করেছেন, আমি তার নিকট থেকে আমার অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি। কিন্তু তার সাথে আমার অন্য কোনো শত্রুতা নেই। আমি আমার অধিকার ফেরৎ পাওয়া ছাড়া তার কোনো প্রকার অমঙ্গল কামনা করি না। বরং আমি সর্বদা তার জন্য দু'আ করি। এভাবে হৃদয়কে অভ্যস্ত করলে ইন্‌শা আল্লাহ আমরা এ মহান গুণ অর্জন করতে পারব।

৩. ধৈর্যধারণ ও সুন্দর আচরণ

মন নিয়ন্ত্রণ করে সহজেই অত্যন্ত বেশি সাওয়াব অর্জনের অন্যতম মাধ্যম সবর বা ধৈর্যধারণের গুণ অর্জন করা। ধৈর্য মুমিনের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ও ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধৈর্য বলতে নিষ্ক্রিয় নির্জীবতা বুঝানো হয় না, বরং সক্রিয় আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বুঝানো হয়। পারিপার্শিক অবস্থা বা অন্যের আচরণ দ্বারা নিজের আচরণ প্রভাবিত না করে নিজের স্থির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে নিজেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা। এক কথায় Re-active না হয়ে Pro-active হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "ধৈর্য ও উদারতাই সর্বোত্তম ঈমান।" হাদীসটি সহীহ।[২৭]

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধৈর্য তিন প্রকারের: (১) বিপদ-আপদ ও কষ্টে ধৈর্য, (২) পাপ ও লোভ থেকে ধৈর্য এবং (৩) ক্রোধের মধ্যে ধৈর্য। তিন ক্ষেত্রেই ধৈর্যধারণ জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়। আবূ দারদা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বলেন: "তুমি ক্রোধান্বিত হবে না তাহলেই জান্নাত তোমার প্রাপ্য হবে।"[২৮]

ক্রোধ সম্বরণ করা ও ক্রোধের সময় আত্ম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্যে রয়েছে, ক্রোধান্বিত হলে 'আউযু বিল্লহি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম' পাঠ করা, আল্লাহর ক্রোধের কথা স্মরণ করা, উত্তেজিত অবস্থায় কথা না বলে চুপ করে থাকা, মুখে-মাথায় ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করা, ওজু করা, দাঁড়িয়ে বা বসে থাকলে শয়ন করা ইত্যাদি।

---

[২৭] আলবানী, সিলসিলাতুস সাহীহাহ ৩/৪৮২, নং ১৪৯৫।

[২৮] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/৭০। হাদীসটির সনদ সহীহ।

ক্রোধের সময় আত্মনিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি যার কারণে ক্রোধের উদ্রেক হয়েছে বা যে কষ্ট দিয়েছে তাকে ক্ষমা করতে ও তার সাথে উত্তম আচরণ করতে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে আল্লাহ তার মর্যাদা রক্ষা করবেন ও দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। বিরক্তি ও ক্রোধে উত্তেজিত অবস্থায় যদি কেউ রাগ প্রকাশের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা সম্বরণ করে তবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার হৃদয়কে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবেন।" হাদীসটি হাসান।[২৯]

ধৈর্যের মাধ্যমেই আমরা উত্তম আচরণের গুণ অর্জন করতে পারি। আর সমাজের সকলের সাথে উত্তম ও শোভনীয় আচরণ করা আল্লাহর প্রিয়তম ইবাদতসমূহের অন্যতম। আবূ দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "কিয়ামতের দিন কর্মবিচারের পাল্লায় বান্দার সবচেয়ে ভারী ও মূল্যবান কর্ম হবে সুন্দর-অমায়িক আচরণ এবং সুন্দর আচরণের অধিকারী মানুষ শুধু তার সুন্দর ব্যবহারের বিনিময়েই নফল সালাত ও নফল সিয়াম পালন করার সাওয়াব অর্জন করবে।[৩০]

হাদীসের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, হুসনে খুলুক বা সুন্দর আচরণের তিনটি দিক রয়েছে। **(ক)** কথা ও আচরণের ক্ষেত্রে বিনম্রতা, প্রফুল্ল চিত্ত, হাস্যোজ্জ্বল মুখ, সত্য পরায়ণতা, কম কথা বলা ও বেশি শ্রবণ করা। **(খ)** কোনো কারণে ক্রোধান্বিত হলে গালিগালাজ, অভিশাপ ও সীমালঙ্ঘণ বর্জন করা। **(গ)** ক্ষমা করা, বিশেষত প্রতিশোধ নেওয়া বা প্রতিউত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করা। এরূপ আচরণের অধিকারী কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবচেয়ে নৈকট্যের মর্যাদায় সমাসীন হবেন। আর এর বিপরীত আচরণের অধিকারী সবচেয়ে দূরবর্তী অবস্থানে থাকবেন।[৩১]

৪. আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ

অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করা ও সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশায় হৃদয়কে ভরপুর রাখা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা আল্লাহর সর্বোত্তম ইবাদতের অন্যতম।"[৩২]

যত কঠিন বিপদ বা সমস্যাই আসুক না কেন, মুমিনের হৃদয়ে অবিচল আস্থা থাকে যে, তার করুণাময় দয়াময় প্রতিপালক তাকে অবশ্যই সাহায্য

---

[২৯] হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১; আলবানী, সহীহুল জামি ১/৯৭।

[৩০] হাদীসটি সহীহ। তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৬৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/২২; আলবানী, সহীহুল জামি ২/৯৯৮।

[৩১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৩৭০। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৩২] আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২৯৮ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ২/৩৯৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/২৮৫; হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৮/৩১। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

করবেন এবং তার জন্য যা কল্যাণকর তারই ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহর রহমতের প্রতি অবিচল আস্থার সামান্যতম ঘাটতি ঈমানেরই ঘাটতি। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া, হতাশা বা অবসাদে আক্রান্ত হওয়া অবিশ্বাসেরই নামান্তর। কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেন: "একমাত্র কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউই আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।"[৩৩]

ভবিষ্যৎ নিয়ে হতাশা ও দুশ্চিন্তা শয়তানের বিদ্যালয়ের অন্যতম পাঠ্য। মহান করুণাময় আল্লাহ বলেন: "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বরকত-রহমতের অঙ্গীকার করেন।"[৩৪] সাম্ভাব্য বিপদের ক্ষেত্রে তো নয়ই, প্রকৃত বিপদের ক্ষেত্রেও মুমিন হতাশ হন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এ বিপদের মধ্যে দুনিয়া-আখিরাতের কোনো না কোনো কল্যাণ রয়েছে।

আল্লাহ বলেন: "নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।"[৩৫] এজন্য মুমিন বিপদ বা অসুবিধার মধ্যে নিপতিত হলে এ ভেবে খুশি হন যে, এ কষ্ট মূলত আগত স্বস্তিরই পূর্বাভাস মাত্র। মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলো তাঁর রহমতের আশায় ভরে দিন এবং সকল হতাশা ও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত রাখুন।

৫. কৃতজ্ঞতা ও সন্তুষ্টি

শুক্‌র অর্থ কৃতজ্ঞতা, রিদা অর্থ সন্তুষ্টি এবং কানা'আত অর্থ স্বল্পে তুষ্টি। এ তিনটি কর্মে মুমিনের মনকে অভ্যস্ত করতে হবে। এগুলো দুনিয়া ও আখিরাতের অনন্ত নিয়ামতের উৎস। আল্লাহ বলেন: "যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে আমি আরো বাড়িয়ে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে আমার শাস্তি বড় কঠিন।"[৩৬]

আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। আবার অনেক কষ্টও রয়েছে। আমরা কখনোই কষ্ট ও অসুবিধাগুলোকে বড় করে দেখব না। কষ্টের কথা বারবার মনে করে জাবর কাটব না। বরং আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত, শান্তি, সুখ বারবার স্মরণ করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব। আল্লাহর অগনিত নিয়ামতের মধ্যে কিছু কষ্টের কারণে যদি গোনাহ ক্ষমা হয় ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় তাহলে অসুবিধা কী? দুনিয়ায় প্রতিটি মানুষের জীবনেই বিপদাপদ ও অসুবিধা আসে। কাজেই আমার জীবনে তো কিছু অসুবিধা থাকবেই। বিপদ ও সমস্যা তো আরো কঠিন হতে পারত। অনেকের জীবনেই তো আমার চেয়েও অধিক কষ্ট আছে। কাজেই আমার হতাশ হওয়ার কিছু নেই।

---

[৩৩] সূরা ইউসূফ, ৮৭ আয়াত।
[৩৪] সূরা বাকারা, ২৬৮ আয়াত।
[৩৫] সূরা আলাম নাশরাহ, ৫-৬ আয়াত।
[৩৬] সূরা ইবরাহীম, ৭ আয়াত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সম্পদে, শক্তিতে বা রিয্‌কে তোমাদের চেয়ে উত্তম কারো দিকে যখন তোমাদের কারো দৃষ্টি পড়বে, তখন যেন সে তার চেয়ে খারাপ অবস্থায় যারা আছে তাদের দিকেও দৃষ্টি করে। তাকে আল্লাহ যে নিয়ামতে দিয়েছেন তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় এটি।"[৩৭]

অতি সামান্য নেয়ামতেরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাস তৈরি করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি অল্পের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে বেশিরও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[৩৮]

আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার দাবি, বান্দার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের প্রতি সামান্যতম সহযোগিতা করেন তবে আমাদের দায়িত্ব, তার প্রতি পরিপূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। সম্ভব হলে তাকে প্রতিদান দেওয়া। না হলে তার জন্য দু'আ করা এবং তার উপকারের কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করা ও বলা। বিভিন্ন হাদীসে এ বিষয়ে বারবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৬. নির্লোভতা ও আখিরাতমুখিতা

যুহ্‌দ অর্থ নির্লোভতা, নির্লিপ্ততা, কৃচ্ছতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি। ইসলামে সন্ন্যাস বা সংসারত্যাগের বৈরাগ্য নিষিদ্ধ। সাংসারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে অবস্থান করে জাগতিক সম্পদ ও সম্মানের লোভ থেকে হৃদয়কে বিমুক্ত রাখতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা, সম্মান ও অসম্মান সকল অবস্থায় হৃদয়ের অবস্থা এক থাকাই ইসলামী বৈরাগ্য। আল্লাহ যখন যেভাবে রাখবেন তখন সে অবস্থায় বান্দা তার দায়িত্বগুলো পালন করতে সচেষ্ট থাকবেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি থাকলে তা দিয়ে বান্দা যথাসাধ্য আখিরাতের পাথেয় অর্জনের চেষ্টা করেন। সম্পদ বা প্রতিপত্তি না থাকলে বান্দা ভারমুক্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নিরিবিলি আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে ব্যস্ত থাকেন। যে কোনো সময়ে তার মালিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ আবাসে গমনের জন্য তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন।

এ জগতে মুমিন একজন পথচারী বা প্রবাসী মাত্র। বাস, রেল বা বিমানে ভাল সিট পেতে চান যাত্রী, কিন্তু ভাল সিট না পেলে দুশ্চিন্তায় মনকে ভারাক্রান্ত করেন না। যে সিট পেয়েছেন তাতে বসেই নিজের গন্তব্যস্থলে গমন করেন। পথের সৌন্দর্য ও শান্তি তাকে আনন্দিত করে। কিন্তু পথের কষ্ট তাকে হতাশ করে না।

---

[৩৭] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/২২৭৫; তিরমিযী, আস-সুনান ৪/২৪৫।

[৩৮] আহমদ, আল-মুসনাদ ৪/২৭৮; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২১৭। হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি চাটাইয়ের উপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি ঘুম থেকে উঠলে আমরা দেখলাম যে, তার দেহে চাইয়ের দাগ হয়ে গিয়েছে। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা আপনার জন্য একটি বিছানা বানিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, "আমার সাথে দুনিয়ার কী সম্পর্ক! দুনিয়াতে আমার অবস্থা অবিকল সেই আরোহীর মত, যে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিয়েছে এবং এরপর গাছটি ফেলে রেখে সে চলে গিয়েছে।"[৩৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তুমি দুনিয়াতে এমন হও, যেন তুমি প্রবাসী অথবা পথচারী। ইবনু উমার বলতেন, যখন সন্ধ্যা হবে, তখন তুমি পরবর্তী সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এ অপেক্ষা করবে না। আর যখন সকাল হবে তখন তুমি পরবর্তী সন্ধ্যার অপেক্ষায় থাকবে না। তোমার সুস্থতা থেকে তুমি তোমার অসুস্থতার পাথেয় সংগ্রহ কর এবং তোমার জীবন থেকে তুমি তোমার মৃত্যুর জন্য পাথেয় গ্রহণ কর।"[৪০] সাহল ইবনু সা'দ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "দুনিয়ার বিষয়ে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন, আর মানুষের হাতে যা আছে তা থেকে নির্লিপ্ত-নির্লোভ হও, তাহলে মানুষ তোমাকে ভালবাসবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪১]

সম্মানিত পাঠক, নির্লোভতা ও প্রশান্তিপূর্ণ পবিত্র হৃদয় ও জীবন অর্জনের অন্যতম পথ আখিরাতমুখিতা। আনাস (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "যে ব্যক্তির চিন্তা-উৎকণ্ঠা আখিরাত নিয়ে আবর্তিত আল্লাহ তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সচ্ছলতা প্রদান করেন, তার কর্মকাণ্ড সুগোছালো বানিয়ে দেন এবং দুনিয়া অনুগত ও বাধ্য হয়ে তার নিকট আগমন করে। আর যে ব্যক্তির চিন্তা-উৎকণ্ঠা দুনিয়া নিয়ে আবর্তিত আল্লাহ তার দুচোখের মাঝে দারিদ্র্য রেখে দেন, তার কর্মকাণ্ড বিক্ষিপ্ত বানিয়ে দেন এবং দুনিয়া থেকে সে ততটুকুই অর্জন করতে পারে যা তার জন্য নির্ধারিত।" হাদীসটি সহীহ।[৪২]

প্রতিদিন সুযোগ পেলেই জীবনের অস্থায়িত্ব ও আখিরাতের স্থায়িত্ব স্মরণ করতে হবে। চলেই যখন যেতে হবে, তখন যে কয় দিন থাকি কল্যাণ ও ভালবাসার মধ্যে থাকি। আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করি। হানাহানি, হিংসা, প্রতিহিংসা বা লোভ করে কি লাভ হবে? আমি কি এ সবের ফল ভোগ করতে পারব? কতদিনই বা এগুলো ভোগ করব? কি দরকার ক্ষণস্থায়ী হিংসা, প্রতিহিংসা বা লোভের জন্য চিরস্থায়ী অকল্যাণ ও অমঙ্গল গ্রহণ করার?

---

[৩৯] তিরমিযী, ৪/৫৮৮। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।
[৪০] বুখারী, আস-সহীহ ৫/২৩৫৮।
[৪১] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ২/১৩৭৩; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৩৪৮; আলবানী, সহীহুল জামি ১/২২০।
[৪২] তিরমিযী (৩৮-কিতাব সিফাতিল কিয়ামাহ, ৩০-বাব) ৪/৫৫৪, নং ২৪৬৫ (ভা ২/৭৩)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাধারণ নেক আমলের ওযীফা

(ক) ওযীফার পরিচয় ও গুরুত্ব

'ওযীফা' অর্থ দৈনন্দিন বা নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্ম বা কর্মসূচী। দৈনন্দিন বেতন বা রেশনকেও আরবীতে ওযীফা বলা হয়। এ অর্থে মুমিনের জীবনের ফরয ও নফল সকল নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্মই ওযীফা। তবে সাধারণভাবে আমরা 'ওযীফা' বলতে 'সুন্নাত-নফল' ইবাদতের 'ওযীফা'-ই বুঝি। কারণ 'ফরয-ওয়াজিব' ইবাদতের 'ওযীফা' তো আল্লাহ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তাতে পরিবর্তনের কোনো সুযোগ নেই। সকল দেশের সকল মুসলিমের জন্যই 'ফরয ওযীফা' একই প্রকারের। 'সুন্নাত-নফল' ইবাদতের ওযীফার ক্ষেত্রে মুমিনের জন্য কিছু 'নিজস্ব কর্মচূচী'-র সুযোগ আছে। হাদীসে 'ওযীফা'-কে 'হিযব' বলা করা হয়েছে।

আমরা দেখেছি যে, ফরয ইবাদত পালনের সাথে সাথে অবিরত নফল ইবাদত পালন করতে থাকাই আল্লাহর নৈকট্য ও বন্ধুত্বের পথ। আর এভাবে অবিরত নফল ইবাদত করতে করতে মানুষ আল্লাহর মাহবূব বা প্রিয় বান্দায় পরিণত হয়। বান্দার জীবনে এর চেয়ে বড় নিয়ামত ও তৃপ্তি আর কিছুই নেই।

নফল ইবাদত বিভিন্ন প্রকারের। ইলম, নামায, রোযা, দান, তিলাওয়াত, দাওয়াত ইত্যাদি সকল ইবাদতেরই ফরয ও নফল পর্যায় রয়েছে। মুমিন নিজের আগ্রহ ও সাধ্য অনুসারে সহীহ সুন্নাতের আলোকে কিছু নফল ইবাদত বেছে নিয়ে নিজের জন্য দৈনন্দিন, সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক একটি নির্ধারিত কর্মসূচি ও কর্মতালিকা অর্থাৎ ওযীফা তৈরি করে নেবেন। সকলের জন্য কুরআন-হাদীস থেকে ওযীফা তৈরি করা সম্ভব হয় না। এজন্য এখানে সহীহ হাদীসের আলোকে সহজে পালনীয় বেশি সাওয়াবের কিছু 'নফল' ইবাদতের ওযীফা প্রদান করা হলো।

(খ) নামাযের ওযীফা

আল্লাহর নৈকট্যলাভের শ্রেষ্ঠ আমল 'সালাত' বা নামায। ফরয ইবাদতগুলোর মধ্যে যেমন ফরয সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ, নফল ইবাদতের মধ্যেও নফল সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ। সালাতের মধ্যে কুরআন পাঠ, যিক্‌র ও দু'আ অন্য সময়ের কুরআন পাঠ, যিক্‌র ও দু'আর চেয়ে উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের মুরাকাবা, মা'রিফাত, যিকর, ক্রন্দন সবকিছুই ছিল মূলত সালাতের মধ্যে। আল্লাহর বেলায়াতের প্রকৃত মজা অর্জনের জন্য নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি:

(১) যথাসম্ভব ধীরে-সুস্থে সালাত আদায়ের চেষ্টা করুন। সালাতের মধ্যে পঠিত সকল যিকর, দুআ ও সূরার অর্থ জানার চেষ্টা করুন। দু-এক মাস একটু চেষ্টা করলেই ৮/১০টি সূরা ও নামযের দুআগুলোর অর্থ শেখা সম্ভব।

(২) সালাতের জন্য কয়েকটি করে সানা, রুকু-সাজদার তাসবীহ-দুআ ও দুআ মাসূরা মুখস্থ করুন। সর্বদা একই দুআ না পড়ে একেক সালাতে একেক সানা ও দুআ পাঠ করুন। এতে সালাতের মনোযোগিতা ও আনন্দ বৃদ্ধি পাবে।

(৩) সালাতের রুকু সাজদা দীর্ঘ করবেন। রুকু সাজদার তাসবীহ বেশি পাঠ করবেন এবং সাজদায় বেশি বেশি দুআ করবেন। একেক সাজদায় একেক দুআ করার চেষ্টা করবেন। সাজদার দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

অমনোযোগিতায় হতাশ হবেন না। ৫ মিনিটের সালাতে যদি ১ মিনিটও সমনোযোগে আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারেন তবুও অনেক বরকত লাভ করবেন। এভাবেই সালাত আল্লাহর সাথে বান্দার সরাসরি গভীরতম সম্পর্ক তৈরি করবে। আপনি 'ইহসান'-এর পর্যায় অর্জন করবেন। এ সকল বিষয় বিস্তারিত জানতে **'রাহে বেলায়াত'** বইটি পাঠ করতে পাঠককে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

এভাবে ফরয সালাত আদায়ের পাশাপাশি মুমিন সর্বদা বেশি বেশি নফল সালাত আদায়ের চেষ্টা করবেন। নফল সালাত সাধারণভাবে সবসময় আদায় করা যায়। তবে সূর্যোদয়, ঠিক দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় সালাত আদায় নিষিদ্ধ। এছাড়া ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দু রাক'আত সুন্নাত সালাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। আসরের ফরয সালাত আদায়ের পরে সুর্যাস্ত পর্যন্ত কোন নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ। অন্যান্য সকল সময়ে মুমিন সুযোগ পেলেই নফল সালাত আদায় করবেন।

বিভিন্ন সহীহ হাদীসে সাধারণভাবে যত বেশি পারা যায় নফল সালাত আদায়ের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এক সাহাবী প্রশ্ন করেন, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কর্ম কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে (বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে); কারণ তুমি যখনই আল্লাহর জন্য একটি সাজদা কর, তখনই তার বিনিময়ে আল্লাহ তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তোমার একটি পাপ মোচন করেন।"[৪৩]

অন্য এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর নিকট আবেদন করেন যে, তিনি জান্নাতে তাঁর সাহচর্য চান। তিনি বলেন: "তাহলে বেশি বেশি সাজদা করে (নফল সালাত আদায় করে) তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য কর।"[৪৪]

---

[৪৩] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।
[৪৪] মুসলিম, আস-সহীহ ১/৩৫৩।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, কাজেই যার পক্ষে সম্ভব হবে সে যেন যত বেশি পারে সালাত আদায় করে।"[৪৫]

সাধারণভাবে নফল সালাত ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে বা স্থানে বিশেষ সালাতের বিশেষ মর্যাদা বা ফযীলতের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নের তিন প্রকার সালাতকে দৈনন্দিন ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন:

(১) সালাতুল্লাইল বা তাহাজ্জুদ

ইশার সালাতের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু "নফল" নামায আদায় করা হবে সবই 'কিয়ামুল্লাইল' বা 'সালাতুল্লাইল' অর্থাৎ "রাতের সালাত" বলে গণ্য হবে। রাতে কিছু সময় ঘুমিয়ে উঠে সালাত আদায় করলে তাকে "তাহাজ্জুদের সালাত" বলা হয়। কেউ যদি ইশার সালাত আদায় করে রাত ৯টা বা ১০টায় ঘুমিয়ে পড়েন এবং ১১/১২টায় উঠে নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' ও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি ইশার পরে না ঘুমিয়ে রাত ১১/১২ টার দিকে বা তার পরে কিছু নফল সালাত আদায় করেন তবে তা 'কিয়ামুল্লাইল' বলে গণ্য হলেও 'তাহাজ্জুদ' বলে গণ্য নয়।

ইসলামের অন্যতম নফল ইবাদত কিয়ামুল্লাইল। প্রথম রাতে বা শেষ রাতে, ঘুমানোর আগে বা ঘুম থেকে উঠে অন্তত কিছু নফল সালাত আদায় করা মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। একটু ঘুমিয়ে উঠে 'তাহাজ্জুদ'-রূপে কিয়ামুল্লাইল আদায় করলে তার সাওয়াব ও মর্যাদা বেশি। রাতের শেষভাগে তা আদায় করা সর্বোত্তম।

কুরআনে কোনো সুন্নাত-নফল সালাতের উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু কিয়ামুল্লাইল ও তাহাজ্জুদের কথা বারংবার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারি যে, রাতের একাকী মুহূর্তে সালাতের মাধ্যমে কিছু সময় আল্লাহর যিক্‌রে, তার সাথে মুনাজাতে এবং ইবাদতে ব্যয় করা মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআনে প্রায় ২০ আয়াতে কিয়ামুল্লাইল-তাহাজ্জুদের কথা বলা হয়েছে।

কিয়ামুল্লাইল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অগণিত নির্দেশনা রয়েছে। আমর ইবনু আমবাসাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "মহান প্রতিপালক তাঁর বান্দার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন রাতের শেষ অংশে। কাজেই তুমি যদি সে সময়ে আল্লাহর যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার তবে তা হবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৬] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফরয সালাতের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে

[৪৫] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ১/৮৪, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৪৯, আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২২৬। হাদীসটি হাসান।

[৪৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৯ (৩৫৭৪), মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৩, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৮২, জামিউল উসূল ৪/১৪৩-১৪৪।

ফযীলতপূর্ণ সালাত রাতের সালাত বা রাতের গভীরে আদায়কৃত সালাত।"[৪৭] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "হে মানুষেরা তোমরা সালামের প্রচলন কর, খাদ্য প্রদান কর, আত্মীয়তা রক্ষা কর এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় কর, তাহলে তোমরা শান্তিতে নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।" হাদীসটি সহীহ।[৪৮]

সাহাবীগণ কিয়ামুল্লাইল পরিত্যাগ পছন্দ করতেন না। আয়েশা (রা) বলেছেন: "কখনো কিয়ামুল্লাইল ত্যাগ করবে না ; কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনো তা ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি অনুভব করতেন তবে তিনি বসে তা আদায় করতেন।"[৪৯] হাদীসে আমরা দেখি যে, কোনো সাহাবী তাহাজ্জুদ পালনে অবহেলা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপত্তি করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণত 'বিত্‌র'-সহ মোট এগার রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি অধিকাংশ সময় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। তিনি তাহাজ্জুদের তিলাওয়াত খুব লম্বা করতেন। এক রাক'আতে অনেক সময় ৪/৫ পারা কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রুকু ও সাজদাও অনুরূপভাবে দীর্ঘ করতেন। রুকু থেকে উঠে ও দু সাজদার মাঝেও দীর্ঘ সময় কাটাতেন। তিলাওয়াতের সময় তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থ অনুসারে থেমে থেমে দু'আ করতেন। তাহাজ্জুদের সালাতের মধ্যে তিনি ক্রন্দন করতেন।

প্রত্যেক মুমিনের উচিত তাহাজ্জুদ পালনে সচেষ্ট হওয়া। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ে অসুবিধা হলে, প্রথম রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে সাধ্যমত ২/৪/৮ রাক'আত সালাত আদায় করে এরপর বিতর আদায় করবেন। এরপর মনের আবেগ ও ভালবাসা দিয়ে আল্লাহর কাছে সারাদিনের নিয়ামতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, নিজের, বন্ধুদের ও শত্রুদের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়ে, সমস্যাদির জন্য সাহায্য চেয়ে এবং তাঁর সার্বিক রহমত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করে ঘুমাতে যাবেন।

অনেকেরই কুরআনের সামান্য অংশ বা মাত্র কয়েকটি ছোট সূরা মুখস্থ। এজন্য তাহাজ্জুদের দীর্ঘ তিলাওয়াতের সুন্নাত পালন তাদের জন্য কষ্টকর। কিন্তু নিম্নের বিষয়গুলোর দিকে লক্ষ্য রাখলে সুন্নাত পদ্ধতিতে তাহাজ্জুদ পালন সহজ হবে:

(ক) বড় সূরা মুখস্থ না থাকলে আমরা তাহাজ্জুদের প্রতি রাকআতে সাধ্যমত কয়েকটি সূরা পড়তে পারি। যেমন প্রথম রাকআতে ফীল, কুরাইশ, মাঊন, কাওসার... পড়া এবং দ্বিতীয় রাকআতে কাফিরূন, নাসর, লাহাব... পড়া। প্রত্যেকে নিজের মুখস্থ সূরাগুলোকে এভাবে ভাগ করে নিতে পারেন।

---

[৪৭] মুসলিম, আস-সহীহ ২/৮২১।
[৪৮] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৫২।
[৪৯] হাদীসটি সহীহ। সুনানু আবী দাউদ ২/৩২, নং ১৩০৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৩১।

(খ) আমরা প্রত্যেকেই তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল্লাইল সালাতে রুকু ও সাজদার তাসবীহ দীর্ঘ সময় অনেক বার পড়তে চেষ্টা করব। এছাড়া রুকু ও সাজদার অতিরিক্ত কিছু যিকর মুখস্থ করে তা বারবার পাঠ করতে চেষ্টা করব। গণনা বা সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী নয়।

(গ) রুকুর পরের দাঁড়ানো এবং বিশেষ করে দু সাজদার মাঝে বসা সাধ্যমত দীর্ঘ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদে দু সাজদার মাঝে বারবার 'রাব্বিগফিরলী' 'হে আমার রব্ব আমাকে ক্ষমা করুন' বলে বলে দীর্ঘ সময় কাটাতেন।

(ঘ) পঠিত সূরা, যিকর ও দুআগুলোর অর্থ গুরুত্ব সহকারে শিখতে হবে। যেন তাহাজ্জুদের প্রকৃত আনন্দ, বরকত ও ফলাফল লাভ করা যায়।

(২) সালাতুদ্দোহা বা চাশত

'দোহা' (الضحى) আরবী শব্দ। বাংলায় সাধারণত 'যোহা' উচ্চারণ করা হয়। এর অর্থ পূর্বাহ্ন বা দিনের প্রথম অংশ (forenoon)। ফার্সী ভাষায় একে 'চাশ্ত' বলা হয়। সূর্যোদয়ের পর থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আরবীতে দোহা বলা হয়। সূর্যোদয়ের মুহূর্ত থেকে প্রায় ১৫/২০ মিনিট পরে দোহা বা চাশ্তের সালাতের সময় শুরু। দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে যে কোনো সময়ে এ সালাত আদায় করা যায়। 'দোহা'র সালাত দু রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত আদায় করা যায়। তাহাজ্জুদ সালাতের পরে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন নফল সালাত দোহার সালাত। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে এ সালাতকে 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'অধিক তাওবাকারীদের সালাত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের দেশে এ সালাত 'ইশরাকের সালাত' বা 'সূর্যোদয়ের সালাত' বলে পরিচিত। অনেকে সূর্যোদয়ের পরের সালাতকে 'ইশরাকের সালাত' এবং পরবর্তী সময়ের সালাতকে 'চাশ্তের সালাত' বলেন। হাদীস শরীফে "ইশরাকের সালাত" শব্দটি হাদীসে পাওয়া যায় না। সূর্যোদয় থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় নফল সালাত আদায় করলে তা 'সালাতুদ দোহা' বা দোহার সালাত বলে গণ্য হবে।

সালাতুদ্দোহার ফযীলতের অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "যে ব্যক্তি ফজরের সালাত জামা'আতে আদায় করে বসে বসে আল্লাহর যিক্র করবে সূর্যোদয় পর্যন্ত, এরপর দু রাক'আত সালাত আদায় করবে, সে একটি হজ্ব ও একটি ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে: পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ, পরিপূর্ণ (হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব অর্জন করবে।)" হাদীসটি হাসান[৫০]

[৫০] তিরমিযী ২/৪৮১, নং ৫৮৬, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।

এভাবে বসতে না পারলেও দোহার সালাত পৃথকভাবে আদায়ের জন্য হাদীসে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং অশেষ সাওয়াবের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে মাঝে মাঝে দোহার (চাশতের) সালাত আদায় করতেন। যে কোনো মুসলিম, ফজরের জামাতের পরে যিক্‌র করুন বা না করুন, সূর্যোদয়ের পর থেকে দ্বি-প্রহরের মধ্যে দু/চার রাক'আত দোহার সালাত আদায় করলেই বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত অশেষ সাওয়াব ও বরকতের আশা করতে পারবেন। এক হাদীসে আবূ যার গিফারী (রা) বলেন, "আমার প্রিয়তম বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের উপদেশ দিয়েছেন যেগুলো আমি কখনোই পরিত্যাগ করি না: (১) ঘুমানোর আগে বিত্‌র-এর সালাত আদায় করতে, (২) দু রাক'আত সালাতুদ্দোহা (চাশতের সালাত) কখনো পরিত্যাগ না করতে; কারণ তা সালাতুল আওয়াবীন (আল্লাহওয়ালা তওবাকারীগণের সালাত) এবং (৩) প্রতি মাসে তিন দিন সিয়াম পালন করতে।[৫১]

আবু হুরাইরা (রা) এবং আবু দারদা (রা) একইভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁদেরকে উপরের তিনটি কাজের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন এবং তিনি জীবনে তা পরিত্যাগ করবেন না।[৫২] আবু যার (রা) বলেন, নবীয়ে আকরাম ﷺ বলেছেন, মানুষের দেহের প্রত্যেক জোড়া ও গিটের জন্য (শুকরিয়াস্বরূপ) প্রতিদিন সকালে দান করা তাঁর জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব। ... দু রাক'আত দোহার (চাশতের) সালাত আদায় করলে এ দানের দায়িত্ব পালিত হয়ে যাবে।"[৫৩]

(৩) মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সালাত (আওয়াবীন)

মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত সময়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজে ও তাঁর সাহাবীগণ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করতেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বলা হয়েছে, মাগরিবের পর থেকে ইশা'র সালাত পর্যন্ত যে সালাত আদায় করা হয় তা 'সালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'বেশি বেশি তাওবাকারীগণের সালাত'। আমরা উপরের সহীহ হাদীসগুলোতে দেখেছি যে, চাশতের নামাযকে 'সালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়েছে। অর্থের দিক থেকে দুটি নামকরণের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। 'আওয়াব'গণ বা আল্লাহওয়ালা ও তাওবাকারী আবিদ বান্দাগণ শুধু দোহার (চাশতের) সালাত পড়েন, মাগরিবের পরে সালাত পড়েন না, এরূপ নয়। উভয় সময়েই তাঁরা নফল সালাত আদায় করেন।

হুযাইফা (রা) বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর কাছে এসে তাঁর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। তিনি মাগরিবের পরে ইশা'র সালাত পর্যন্ত

---

[৫১] সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২৩৭। দেখুন: সহীহ মুসলিম ১/৪৯৯।)

[৫২] সহীহ বুখারী ১/৩৯৫, নং ১১২৪, ২/৬৯৯, নং ১৮৮০, সহীহ মুসলিম ১/৪৯৯, নং ৭২১, ৭২২, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৮।

[৫৩] সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০।

নফল সালাতে রত থাকলেন।" হাদীসটি সহীহ।[৫৪] আনাস (রা) বলেন, "সাহাবীগণ মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ে সজাগ থেকে অপেক্ষা করতেন এবং নফল সালাত আদায় করতেন।"[৫৫] হাদীসটি সহীহ। হাসান বসরী বলতেন, মাগরিব ও ইশা'র মধ্যবর্তী সময়ের সালাতও রাত্রের সালাত বা তাহাজ্জুদের সালাত বলে গণ্য হবে।[৫৬] বিভিন্ন হাদীসে আমরা দেখি যে, কোনো কোনো সাহাবী তাবেয়ীগণকে এ সময়ে সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন।[৫৭]

এ সময়ে কত রাক'আত সালাত আদায় করতে হবে সে বিষয়ে কোনো সহীহ হাদীস নেই। মুমিন নিজের সুবিধা ও সাধ্যমতো এ সময়ে নফল সালাত আদায় করবেন। একটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে কোনো বাজে কথা বলার আগে ৬ রাক'আত সালাত আদায় করবে সে ১২ বৎসর ইবাদত করার সমপরিমাণ সাওয়াব অর্জন করবে।[৫৮]

এছাড়া নিম্নের নফল সালাতগুলো যথাসম্ভব পালনের চেষ্টা করবেন:

(৪) তাহিয়্যাতুল ওযূ

দিনে বা রাতে যে কোনো সময়ে ওযু করার পরেই দু রাক'আত সালাত আদায় করার অতুলনীয় ফযীলত বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

(৫) তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (দুখুলুল মাসজিদ)

মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগে যে সালাত আদায় করা হয় তা তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা মসজিদের সালাম নামে পরিচিত। মসজিদের পাওনা যে, মুমিন মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে অন্তত কিছু সালাত আদায় করবে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বারবার নির্দেশ দিয়েছেন যে, মসজিদে প্রবেশ করলে অন্তত দু রাক'আত সালাত আদায় না করে কখনোই বসবে না। মসজিদে প্রবেশ করে বসার আগেই সুন্নাত সালাত আদায় করলে বা জামাতে দাঁড়িয়ে গেলেও এতে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' আদায় হবে। না হলে- মাকরূহ ওয়াক্ত ছাড়া অন্য সময়ে- অন্তত দু রাক'আত নফল সালাত আদায় করে বসতে হবে।

(৬) সালাতুত তাসবীহ

যিক্‌রের মূল চারটি বাক্য: 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদু লিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' সহকারে সালাত আদায় করাকে সালাতুত তাসবীহ বলে। চার রাক'আত সালাতে প্রতি রাক'আতে ৭৫ বার করে চার

---

[৫৪] ইবনু আবী শাইবা, মুসান্নাফ ২/১৫, নাসাঈ, সুনানুল কুবরা ১/৫১, ৫/৮০, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।

[৫৫] আবূ দাউদ, আস-সুনান ২/৩৫; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।

[৫৬] বাইহাকী, আস-সুনানুল কুবরা ৩/১৯,সুনানু আবী দাউদ ২/৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/২৩০, ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ ২/১৫, সহীহুত তারগীব ১/৩১৩।

[৫৭] মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ২/১৪-১৬।

[৫৮] তিরমিযী ২/২৯৮, নং ৪৩৫। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ।

রাক'আতে মোট ৩০০ বার উক্ত যিক্‌রগুলো আদায় করতে হবে।

(৭) সালাতুত তাওবা

আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো বান্দা যদি কোনো গোনাহের কর্ম করে সাথে সাথে সুন্দর করে ওযু করে দু রাক'আত সালাত আদায় করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তবে আল্লাহ তাঁকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন।"[৫৯]

(৮). সালাতুল ইসতিখারা

বিপদে বা সমস্যায় নামায পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া মুমিনের দায়িত্ব। আল্লাহ বলেছেন: 'ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রীতি ছিল, কোনো বিপদ, দুশ্চিন্তা বা সমস্যা দেখা দিলে তিনি সালাত আদায় করতেন। এজন্য বিপদে আপদে অধৈর্য না হয়ে সাধ্যমত নফল সালাত আদায় করবেন। এছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে 'সালাতুল ইসতিখারা' আদায় করবেন। এ সকল সালাত বিষয়ক আলোচনা **'রাহে বেলায়াত'** পুস্তকে দেখুন।

(গ) রোযার ওযীফা

সিয়াম বা রোযা মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত। ফরয সিয়ামের পাশাপাশি বেশি বেশি নফল সিয়াম পালন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণের অন্যতম রীতি ছিল। তাঁরা নফল সিয়াম পালনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব আরোপ করতেন। তাঁরা নিয়মিত ও অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন। প্রতি দুদিন পর একদিন, একদিন পর একদিন, প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার, প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ, প্রতি মাসের প্রথমে ও শেষে নিয়মিত নফল সিয়াম পালনের বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। এছাড়া সুযোগমতো যত বেশি সম্ভব অনিয়মিত নফল সিয়াম পালন করতেন তিনি।

তাযকিয়া, বেলায়াত ও ইহসানের পথে সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। বৎসরের ৫টি দিন ছাড়া অন্য যে কোনো সময়ে নফল সিয়াম পালন করা যায়। প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 'আইয়াম বীযের' নফল সিয়াম পালনকে নিয়মিত ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন। এছাড়া আশূরার সিয়াম ও আরাফাতের দিবসের সিয়াম পালন করবেন। এ সকল দিবসে সিয়াম পালনের অকল্পনীয় সাওয়াবের কথা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সুযোগমত বেশি বেশি নফল সিয়াম পালনের চেষ্টা করবেন।

(ঘ) ইলমের ওযীফা

ইলম অর্জন করা একটি পৃথক ইবাদত। নিজের ঈমান ও আমল বিশুদ্ধ

[৫৯] সুনানুত তিরমিযী ২/২৫৭, নং ৪০৬, ৫/২২৮, নং ৩০০৬, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২১, সহীহ ইবনু হিব্বান ২/৩৯০, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/২১৬, সহীহু সুনানি আবী দাউদ ১/২৮৩।

করার মত ইলম অর্জন করা ফরয। এরপর ইলম অর্জন করা 'নফল' ইবাদত হিসেবে সর্বোত্তম ইবাদত। অন্য নেক আমল বেশি করার চেয়ে ইলম বেশি করে শিক্ষা করার সাওয়াব বেশি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ইবাদতের মর্যাদার চেয়ে ইলমের মর্যাদা অধিকতর বা অতিরিক্ত ইবাদতের চেয়ে অতিরিক্ত ইলম উত্তম।[৬০]

ইলমের মর্যাদার বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে অনেক নির্দেশনা রয়েছে। আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে, এ মহান মর্যাদা বোধহয় শুধু মাদ্রাসায় যারা পড়েন অথবা যারা প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ইলম শিক্ষা করেন তাদের জন্যই। প্রকৃত বিষয় তা নয়। যে কোনো বয়সের যে কোনো মুমিন ওয়ায মাহফিলে, মসজিদে, শুক্রবারে খুতবার আলোচনায়, আলেমের নিকট প্রশ্ন করার মাধ্যমে, বই পড়ে বা যে কোনো ভাবে ইলম শিক্ষা করলেই এ মর্যাদা ও সাওয়াব লাভ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুই অভিশপ্ত, ব্যতিক্রম হলো, আল্লাহর যিক্‌র এবং যিকর সংশ্লিষ্ট যা কিছু আছে এবং আলিম এবং শিক্ষার্থী বা ইলম অর্জনে রত ব্যক্তি। হাদীসটি হাসান।[৬১]

কিছু সময় ইলম অর্জনে লিপ্ত থাকা অনুরূপ সময় যিক্‌র বা অন্যান্য ইবাদতে লিপ্ত থাকার মতই সাওয়াবের কাজ। উপরন্তু আমরা দুনিয়াতে যত নেক আমল করি সেগুলোর সাথে ইলম শিক্ষার নেক আমলের দুটি বিশেষ পার্থক্য আছে: **(ক)** অন্যকে শিখালে ইলম-এর সাওয়াব চক্রবৃদ্ধিহারে বৃদ্ধি পায় এবং **(খ)** ইলমের সাওয়াব মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যদি কেউ কোনো ইলম শিক্ষা দেয়, তবে সে শিক্ষা অনুসারে যত মানুষ কর্ম করবে সকলের সমপরিমাণ সাওয়াব ঐ ব্যক্তি লাভ করবে, কিন্তু এতে তাদের সাওয়াবের কোনো ঘাটতি হবে না।" হাদীসটি হাসান।[৬২]

ইলম শিক্ষার জন্য নিয়মিত ওযীফা তৈরি করতে হবে। ইলমের মূল উৎস কুরআন ও হাদীস। কুরআন কারীমের কিছু অংশ নিয়মিত বুঝে অনুবাদ বা তাফসীর দেখে পড়বেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত অনুবাদ, তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মা'আরিফুল কুরআন, বায়ানুল কুরআন ইত্যাদি তাফসীর পড়ুন। এছাড়া নিয়মিত অন্তত ২/১ টি হাদীস পাঠ করবেন। সাধারণ যাকিরদের জন্য 'রিয়াদুস সালিহীন' পুস্তকটি খুবই উপকারী। এ পুস্তকটির অনুবাদ নিয়মিত পাঠ করবেন। কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য আলিমদের লেখা ইসলামী বই-পুস্তক নিয়মিত পাঠ ওযীফা হিসেবে গ্রহণ করবেন। এ ছাড়া কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করেন এবং ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনী পরিহার করেন এরূপ আলিমদের ওয়ায-নসীহত ও আলোচনায় সুযোগমত উপস্থিত হবেন।

---

[৬০] হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/১৭১; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১২০। হাদীসটি হাসান।
[৬১] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৫৬১; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১০৬।
[৬২] ইবনু মাজাহ, আস-সুনান ১/৮৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/১০৮।

ইলম শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিজের জীবনে তা পালন করা। কখনোই কিছু শিখে তা নিয়ে বিতর্ক করবেন না। প্রয়োজনে কাউকে কিছু শেখাতে পারেন। তবে কোনোরূপ তর্ক বা ঝগড়া উত্থাপিত হলে তা পরিহার করবেন। এ বিষয়ে আলিমদের সাথে কথা বলার জন্য সকলকে উৎসাহিত করবেন।

(ঙ) দাওয়াতের ওযীফা

নিজের জীবনের ইসলাম প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজের আশেপাশে অবস্থানরত অন্যান্য মানুষদের মধ্যে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা মুমিনের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য মুমিনের জীবনের একটি বড় দায়িত্ব হলো 'আল-আমরু বিল মারূফ ওয়ান নাহ্ইউ আনিল মুনকার', অর্থাৎ 'ন্যায় কাজের নির্দেশ ও অন্যায় থেকে নিষেধ করা', 'ইকামতে দীন' বা দীন প্রতিষ্ঠা করা বা 'আদ-দা'ওয়াতু ইলাল্লাহ' বা 'আল্লাহর দিকে আহ্বান করা'। এ দায়িত্ব কখনো ফরয এবং কখনো নফল। তবে এর ফযীলত ও সাওয়াব অপরিসীম। কুরআন-হাদীসে বারবার এ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং এর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

মুমিন নিয়মিত ওযীফা করে নিবেন প্রতিদিন কিছু মানুষকে ভাল কাজের জন্য ডাকার। এ ছাড়া সুযোগ পেলেই মানুষকে নম্রতা ও বিনয়ের সাথে ভাল কাজের উৎসাহ দিবেন এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবেন।

ভাই, চলেন, জামাতে নামায আদায় করে আসি। ভাই, ধুমপান বাদ দেওয়া যায় না। ... এরূপ একটি বাক্যের সাওয়াব অপরিসীম। কেউ মানুক অথবা না মানুক, কাউকে ভাল কাজের উৎসাহ দিয়ে বা খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করে একটি শব্দ বলা একটি বড় দানের সমতূল্য। আর যদি ঐ ব্যক্তি উক্ত কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভাল কাজ করেন বা খারাপ কাজ ত্যাগ করেন তবে 'দাওয়াত'-কারী ব্যক্তি বা মুবাল্লিগ অপরিমেয় সাওয়াব লাভ করবেন।

(চ) খিদমাতে খালকের ওযীফা

আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি, বিশেষত মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া। যে কোনো জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। অন্যান্য ইবাদত এবং সেবামূলক ইবাদতের মধ্যে তিনটি পার্থক্য বিদ্যমান: **(ক)** তাহাজ্জুদ, যিকর ইত্যাদি ইবাদতের চেয়ে খিদমাতে খালকের সাওয়াব বহুগুণ বেশি, **(খ)**

অন্যান্য ইবাদতের সাওয়াব মূলত আখিরাতের জন্য আর খিদমাতে খালকের কারণে আল্লাহ আখিরাতের সাওয়াব ছাড়াও দুনিয়ায় বরকত দান করেন এবং **(গ)** খিদমাতে খালক জাতীয় ইবাদতের ওসীলা দিয়ে দুআ করলে আল্লাহ বিপদাপদ কাটিয়ে দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমল কোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন।"[৬৩] ... এ অর্থে অনেক হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যদি কেউ কোনো অসুস্থ মানুষকে দেখতে যায় তবে ফিরে না আসা পর্যন্ত সে জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে।"[৬৪] অন্য হাদীসে তিনি বলেন, "যদি কেউ সকালে কোনো অসুস্থ মুসলিমকে দেখতে যায় তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আর যদি বিকালে যায় তবে সকাল পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে।"[৬৫]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন বলেন: "তোমাদের মধ্যে আজ কে সিয়ামরত ছিলে? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ কোনো জানাযায় শরীক হয়েছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি প্রশ্ন করেন: তোমাদের মধ্যে কে আজ দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করেছ? আবু বকর (রা) বলেন: আমি। তিনি আবার প্রশ্ন করেন: আজ তোমাদের কে অসুস্থ কোনো মানুষকে দেখতে গিয়েছ? আবু বকর বলেন: আমি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: এ কর্মগুলো যদি কোনো মানুষের মধ্যে একত্রিত হয় তাহলে সে ব্যক্তি অবশই জান্নাতী হবেন।"[৬৬] মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ কর্মগুলো করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৬৩] মুনযিরী, আত-তাগীব ৩/৩৪৬-৩৫১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, সহীল জামিয়িস সাগীব ১/৯৭।
[৬৪] মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৯৮৯।
[৬৫] তিরমিযী, আস-সুনান ৩/৩০০। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন।
[৬৬] সহীহ মুসলিম ২/৭১৩, নং ১০২৮।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
যিক্‌রের ওযীফা

(ক) যিক্‌রের পরিচয় ও গুরুত্ব

যিক্‌র আরবী শব্দ। বাংলায় এর অর্থ স্মরণ করা বা স্মরণ করানো। যে কোনো প্রকারে মনে, মুখে, কর্ম বা চিন্তার মাধ্যমে, আদেশ পালন করে বা নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আল্লাহর নাম, গুণাবলী, বিধিবিধান, তাঁর পুরস্কার, শাস্তি ইত্যাদি স্মরণ করা বা করানোকে ইসলামের পরিভাষায় যিক্‌র বা আল্লাহর যিক্‌র বলা হয়। ব্যাপক অর্থে ঈমান ও নেককর্ম সবই 'যিক্‌র' বলে গণ্য। এ অর্থে বেলায়াতের পথের আট পর্যায়ের সকল কর্মকেই এক কথায় 'যিক্‌র' বলে অভিহিত করা যায়। বিশেষভাবে মুখে বারবার আল্লাহর নাম, গুণাবলি ইত্যাদি আবৃত্তি বা জপ করা কুরআন-হাদীস নির্দেশিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর তাকবীর, তাহলীল, প্রশংসা, গুণগান, দু'আ, মুনাজাত, ইসতিগফার, দরুদ, সালাম ইত্যাদি সবই এ পর্যায়ের যিক্‌র। মুমিন বসে, শুয়ে, হাটতে, চলতে ওযু-সহ বা ওযূ ছাড়া সর্বাবস্থায় এ সকল যিকর পালন করতে পারেন, যদিও পাক-পবিত্র হয়ে আদব সহ বসে যিক্‌র করা উত্তম।

আমরা দেখেছি যে, বেলায়াতের পথের কর্ম দু পর্যায়ের: ফরয ও নফল। নফল পর্যায়ের যিক্‌রকে বেলায়াতের পথে অন্য সকল নফল ইবাদতের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে হাদীস শরীফে। সর্বোপরি, আত্মশুদ্ধির জন্য কুরআন-হাদীসে যিক্‌রের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রা) বলেন : একব্যক্তি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইসলামের বিধানাবলী আমার জন্য বেশি হয়ে গিয়েছে। আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকব। তিনি বলেন: তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিক্‌রে আর্দ্র থাকে।"[৬৭]

এখানে আমরা দেখছি যে, নফল ইবাদত বহুমুখি ও অনেক। অন্যান্য নফল ইবাদত না করতে পারলেও সর্বক্ষণ জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরে রত রাখা অতীব প্রয়োজন। অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "আমি কি তোমাদেরকে বলব না তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্ম কোন্‌টি? তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের জন্য সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার কারণ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রু নিধন করতে করতে শাহাদত

[৬৭] সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, নং ৩৩৭৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৯৬, ইবনু মাজাহ ৩৭৯৩, মুসতাদরাক হাকেম ১/৪৯৫, হাইসামী, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩১২।

বরণ করার থেকেও উত্তম কর্ম কী তা-কি তোমাদেরকে বলব? সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, সে কর্মটি কী? তিনি বললেন: 'আল্লাহর যিক্‌র।' মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন: আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর যিক্‌রের চেয়ে উত্তম ইবাদত আর কিছুই নেই।" হাদীসটির সনদ হাসান।[৬৮]

অন্য হাদীসে বলা হয়েছে: "আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করতে। আল্লাহর যিক্‌রের উদাহরণ এমন যে, এক ব্যক্তিকে শত্রুগণ ধাওয়া করে তার পিছে দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমতাবস্থায় লোকটি একটি সুসংরক্ষিত দুর্গে এসে পৌঁছাল এবং সে দুর্গের মধ্যে আত্মরক্ষা করল। অনুরূপভাবে বান্দা আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া শয়তানের কবল থেকে রক্ষা পায় না।" হাদীসটি সহীহ।[৬৯]

(খ) সার্বক্ষণিক পালনীয় যিক্‌র-ওযীফা

সকল সময়ে কর্মব্যস্ততার মধ্যে বা কোনোরূপ অবসর পেলে নিম্নের যিক্‌রগুলো বেশিবেশি জপ করবেন। যাকির মনের আবেগ ও আগ্রহ অনুসারে এগুলোর মধ্য থেকে যে কোনো এক বা একাধিক যিক্‌র বেছে নিতে পারেন।

যিক্‌র নং ১ : তাহলীল বা একত্বের ঘোষণা

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই)।

এটি এক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রথম যিক্‌র। এ যিক্‌রটি সর্বদা বেশি বেশি করে জপ করতে বিভিন্ন হাদীসে দীসে বলা হয়েছে। জাবির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "সর্বোত্তম যিক্‌র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সর্বোত্তম দু'আ আলহামদুলিল্লাহ।" হাদীসটি সহীহ।[৭০]

যিক্‌র নং ২: তাসবীহ বা পবিত্রতার ঘোষণা

سُبْحَانَ اللهِ

উচ্চারণ : 'সুব'হা-নাল্লা-হ', **অর্থ :** আল্লাহ পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

যিক্‌র নং ৩: তাহমীদ বা প্রশংসার ঘোষণা

اَلْحَمْدُ لِلهِ

উচ্চারণ : আল্ 'হামদু লিল্লাহ। **অর্থ :** "প্রশংসা আল্লহর জন্য।"

---

[৬৮] মুসনাদ আহমদ ৬/৪৪৬, হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৩, ৭৪, তিরমিযী ৫/৪৫৯, ৩৩৭৭, ইবনু মাজাহ ৩৭৯০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৩

[৬৯] সহীহ ইবনু খুযাইমা ৩/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৫৮২, আত-তারগীব ২/৩৭০-৩৭১।

[৭০] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২৬, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩২৬-৩২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৭৬, ৬৮১।

যিক্‌র নং ৪: তাকবীর বা শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা

اَللهُ أَكْبَرُ

উচ্চারণ : আল্লা-হু আক্‌বার । **অর্থ :** "আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ ।"

উপরের যিক্‌র চারটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য । এগুলো পাঠ ও জপ করার সাওয়াব ও বরকত অপরীমেয় । দু ভাবে এ যিক্‌রগুলো পালন করতে হয়: (১) গণনাবিহীনভাবে সদা সর্বদা জপ করে এবং (২) নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় জপ করে । মুমিন সর্বদা এ বাক্যগুলো জপ করার চেষ্টা করবেন । সর্বদা না পারলে সুযোগমত বেশি বেশি জপ করবেন । এগুলোর ফযীলতে অনেক সহীহ ও হাসান হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে সামুরা ইবনু জুনদুব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য চারটি: 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-'হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লা-হু আকবার' । তুমি ইচ্ছামতো এ বাক্য চারিটির যে কোনো বাক্য আগে পিছে বলতে পার । (বাক্যগুলোর সাজানোর ক্ষেত্রে কোনো নিয়ম বা ফযীলত নেই ।)"[৭১]

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আমি 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার' বলতে এত বেশি পছন্দ করি যে, এগুলো বলা আমার কাছে পৃথিবীর বুকে সূর্যের নিচে বিদ্যমান সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় ।"[৭২] আবু হুরাইরা (রা) আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা যখন জান্নাতের বাগানসমূহে যাবে বা তা অতিক্রম করবে তখন তৃপ্তির সাথে বিচরণ ও ভক্ষণ করবে । আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, জান্নাতের বাগানসমূহ কি? তিনি বললেন: মসজিদসমূহ । আমি বললাম: বিচরণ ও ভক্ষণ কি? তিনি বললেন: 'সুব'হা-নাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' ।" হাদীসটি হাসান ।[৭৩]

ইবনু মাস'ঊদ (রা), সালমান ফারিসী (রা), আবু হুরাইরা (রা) ও ইবনু আব্বাস (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ বাক্য চারটির প্রতিটি বাক্য একবার বললে জান্নাতে একটি করে বৃক্ষ রোপণ করা হয় ।[৭৪] আবু যার (রা) ও আয়েশা (রা) বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "এ বাক্যগুলোর প্রত্যেক বাক্য একবার যিক্‌র করা একবার আল্লাহর ওয়াস্তে দান করার সমতুল্য ।"[৭৫] আবু সালমা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "এ বাক্যগুলো কিয়ামতের

[৭১] সহীহ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭ ।
[৭২] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৫ ।
[৭৩] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৩২, নং ৩৫০৯, আত-তারগীব ২/৪২২, নং ২৩২৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯১ ।
[৭৪] ইমাম মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪০৭-৪০৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৮-৯০ ।
[৭৫] সহীহ মুসলিম ১/৪৯৮, নং ৭২০, ২/৬৯৭, নং ১০০৬ ।

দিন বান্দার আমলনামায় সবচেয়ে ভারী হবে।"[৭৬] আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "এ বাক্যগুলোই জাহান্নামের আগুন থেকে মুমিনের ঢাল।"[৭৭]

আনাস (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "গাছের ডালে ঝাকি দিলে যেমন পাতাগুলো ঝরে যায় অনুরূপভাবে এ যিক্‌রগুলো বললে বান্দার গোনাহ ঝরে যায়।"[৭৮] আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ (রা) উভয়ে নবীয়ে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন: "আল্লাহ এ চারটি বাক্যকে বেছে পছন্দ করে নিয়েছেন। এ বাক্যগুলোর যে কোনো একটি বাক্য একবার বললে আল্লাহ ২০ টি সাওয়াব প্রদান করতেন এবং ২০ টি গোনাহ ক্ষমা করবেন। আর এভাবে যে বেশি বেশি যিক্‌র করবে সে মুনাফিকী থেকে মুক্তি লাভ করবে।"[৭৯] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "এ চারটি বাক্য যিক্‌রকারী প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে সাওয়াব লাভ করবেন।"[৮০]

সাহাবীগণও যিক্‌রগুলো বেশি বেশি পালনে উৎসাহ দিয়েছেন। ইবনু মাসঊদ (রা) বলেন: "সুব'হানাল্লাহ, আল'হামদু লিল্লাহ, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার – বলা আমার নিকট আল্লাহর রাস্তায় সমসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করার চেয়ে বেশি প্রিয়।"[৮১] তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি সম্পদ ব্যয় করতে কৃপণতা বোধ করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় পায় এবং রাত জেগে ইবাদত করতে আলসেমি অনুভব করে, সে যেন বেশি বেশি 'লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু', 'আল্লাহু আকবার', 'আল-'হামদু লিল্লাহ' ও 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলতে থাকে।" হাদীসটি সহীহ।[৮২]

যিক্‌র নং ৫: 'হাওকালাহ' বা নির্ভরতার ঘোষণা

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ (الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ)

উচ্চারণ : লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হ (বিল্লহিল 'আলিয়্যিল 'আযীম)

অর্থ: "কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহ ছাড়া বা

---

[৭৬] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৫০, মুসনাদ আহমদ ৩/৪৪৩, ৪/২৩৭, ৫/৩৬৫, তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ২২/৩৪৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/৪৯, ১০/৮৮।

[৭৭] মুসতাদরাক হাকিম ১/৭২৫, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৮৯, আত-তারগীব ২/৪১৬।

[৭৮] মুসনাদু আহমদ ৩/১৫২, আত-তারগীব ২/৪১৮।

[৭৯] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২১০, মুসনাদ আহমদ ২/৩১০, ৩/৩৫, ৩৭, মুসান্নাফু ইবনু আবী শাইবা ৬/১০৪, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৪, আত-তারগীব ২/৪১০, নং ২২৯৯।

[৮০] তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৬/৩০৯, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৩৮৮, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯১, আত-তারগীব ২/৪২১।

[৮১] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা ৬/৯২, ৭/১৭৬, ১৭৭, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান ১/৪৪৭, ৪৪৮।

[৮২] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ৯/২০৩, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯০, আত-তারগীব ২/৪২০-৪২১।

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (যিনি সর্বোচ্চ-সুমর্যাদাময়) ।"

এ বাক্যের বেশি বেশি যিক্‌র বা জপ করার নির্দেশে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তোমরা বেশি বেশি বেশি করে 'চিরস্থায়ী নেককর্মগুলো' কর। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন: এগুলো কি? তিনি বললেন: তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহলীল (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু), তাসবীহ (সুব'হা-নাল্লাহ), তাহমীদ (আল-'হামদু লিল্লাহ) এবং 'লা-হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ।" হাদীসটির সনদ হাসান ।[৮৩] আবু মুসা (রা), আবু হুরাইরা (রা), আবু যার (রা), মু'আয ইবনু জাবাল (রা), সা'দ ইবনু উবাদাহ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলবে, কারণ এ বাক্যটি জান্নাতের ভাণ্ডারগুলোর মধ্যে একটি ভাণ্ডার ও জান্নাতের একটি দরজা ।[৮৪]

আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মি'রাজের রাত্রিতে ইবরাহীম (আ) আমাকে বলেন: আপনার উম্মতকে নির্দেশ দিবেন, তারা যেন বেশি করে জান্নাতে বৃক্ষ রোপণ করে ... । জান্নাতের বৃক্ষ রোপণ লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা ।" হাদীসটির সনদ হাসান ।[৮৫] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "পৃথিবীতে যে কোনো ব্যক্তি যদি বলে: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ মহান, কোনো অবলম্বন নেই এবং কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর সাহায্য ছাড়া), তবে তার সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমান হয় ।" হাদীসটি হাসান ।[৮৬]

যিক্‌র নং ৬: সর্বদা পালনীয় ইসতিগফার

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ (أَنْتَ) التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ (الغَفُوْرُ)

উচ্চারণ : রাব্বিগ্‌ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত তাওয়া-বুর রাহীম । দ্বিতীয় বর্ণনয় "রাহীম"-এর বদলে: 'গাফূর' ।

অর্থ: "হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময় (ক্ষমাকারী) ।

---

[৮৩] মুসনাদ আহমদ ৩/৭৫, ৪/২৬৭, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১২১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৪, ৭২৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ৫/২৪৭, ৭/১৬৬, ১০/৮৬, ৮৭, ৮৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৩৭-৩৩৯ ।

[৮৪] সহীহ বুখারী ৪/১৫৪১, ৫/২৩৪৬, ৫/২৩৫৪, ৬/২৪৩৭, ২৬৯০, সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৮, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৩২-৪৩৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭-৯৯ ।

[৮৫] মুসনাদ আহমদ ৫/৪১৮, আত-তারগীব ২/৪৩৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯৭ ।

[৮৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫০৯, নং ৩৪৬০, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৮২, তারগীব ২/৪১৮, নং ২৩১৪ ।

বেশি বেশি ইসতিগফার করতে বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "হে মানুষেরা তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। নিশ্চয় আমি একদিনের মধ্যে ১০০ বার আল্লাহর নিকট তাওবা বা ইস্তিগফার করি।"[৮৭] ইসতিগফারের মাসনূন বাক্যগুলোর অন্যতম উপরের বাক্যটি। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, আমরা গুণে দেখতাম রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক মাজলিসেই (একবারের যে কোনো বৈঠকের মধ্যে) মাজলিস ত্যাগ করে উঠে যাওয়ার আগে ১০০ বার এ বাক্যটি (রাব্বিগ্ ফিরলী ... গাফূর) বলতেন।[৮৮]

যিক্র নং ৭: (মাসনূন ইসতিগফার)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (الْعَظِيْمَ) الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লা-হাল্ ('আযীমাল্) লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা-হুআল 'হাইউল কাইউমু ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ: "আমি মহান আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব ও সর্ব সংরক্ষক, এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।"

ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: যদি কেউ এ কথাগুলো তিন বার বলে, তবে তার গোনাহসমূহকে ক্ষমা করা হবে, যদি সে জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো কঠিন পাপও করে থাকে।" হাদীসটি সহীহ।[৮৯]

যিক্র নং ৮ : সদা সর্বদা পালনের বিশেষ দু'আ

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ (وَعَافِنِيْ) وَارْزُقْنِيْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মাগ্ ফির্লী, ওয়ার্'হামনী, ওয়াহ্দিনী, ওয়া 'আ-ফিনী, ওয়ারযুকনী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমাকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।"

আসিম (রা) বলেন: কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উপরের বাক্যগুলো দিয়ে বেশি বেশি দু'আ করতে শেখাতেন।[৯০]

এ দু'আর মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই চাওয়া হয়েছে। মুমিনের উচিত সকল ব্যস্ততার মধ্যে সর্বদা এ মুনাজাতটি পাঠ করতে থাকা।

---

[৮৭] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৫, নং ২৭০২।

[৮৮] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৯৪, নং ৩৪৩৪, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/২০৬, নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/১১৯। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৮৯] মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯২, ২/১২৮, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭।

[৯০] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৩, নং ২৬৯৭।

(গ) সময় নির্ধারিত যিক্‌র-ওযীফা

(১) ফজরের ওযীফা

পুরুষের জন্য ওজর ছাড়া জামাত পরিত্যাগ করা কঠিন গোনাহের কাজ। ফজরের সালাত জামাতে আদায় করে সম্ভব হলে সালাতের স্থানেই বসে নিম্নের যিক্‌রগুলো আদায় করবেন। মহিলারা ঘরে নিজের সালাতের স্থানে বসে যিকরগুলো পালন করবেন। মাগরিবের পরেও এ অযীফাগুলো এভাবেই আদায় করবেন।

যিক্‌র নং ৯ (৩ বার)

أَسْتَغْفِرُ اللهَ

উচ্চারণ : আস্তাগফিরুল্লা-হ। **অর্থ :** আমি আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

যিক্‌র নং ১০ (১ বার)

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আপনিই সালাম (শান্তি), আপনার থেকেই শান্তি, আপনি বরকতময়, হে মহাসম্মানের অধিকারী ও মর্যাদা প্রদানের অধিকারী।"

সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষে তিন বার ইস্তিগফার বলে এরপর "আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ... " বলতেন।[৯১] এ বিষয়ে আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যিক্‌র নং ১১ (৭ বার)

اَللّهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আজিরনী মিনান না-র।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন।"

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, তুমি ফজরের সালাতের পরেই (দুনিয়াবী) কথা বলার আগে এ দু'আ ৭ বার বলবে। যদি তুমি ঐ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। অনুরূপভাবে, মাগরিবের সালাতের পরে কথা বলার আগেই এ দু'আ ৭ বার বলবে। তুমি যদি ঐ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন।" অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন।[৯২]

---

[৯১] সহীহ মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।

[৯২] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/৩৩, সুনান আবু দাউদ ৪/৩২০, নং ৫০৭৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৬৭,

যিক্‌র নং ১২ (১ বার)

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

উচ্চারন : লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলক, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লা-হুম্মা, লা- মা-নি'আ লিমা- আ'অ্ত্বাইতা, ওয়ালা- মু'অ্ত্বিয়া লিমা- মানা'অ্তা, ওয়ালা- ইয়ান্‌ফা'উ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু।

অর্থ : "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা দান করেন তা ঠেকানোর ক্ষমতা কারো নেই। আর আপনি যা না দেন তা দেওয়ার ক্ষমতাও কারো নেই। কোনো পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার বাইরে কোনো উপকারে লাগে না।"

মুগীরা ইবনু শু'বা (রা) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের সালামের পরেই এ যিক্‌রটি বলতেন।"[৯৩]

যিক্‌র নং ১৩: আয়াতুল কুরসী (১ বার):

আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে আয়াতুল কুরসী **(সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত)** পাঠ করবে তাঁর জান্নাতে প্রবেশের পথে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা থাকবে না।"[৯৪] অন্য হাদীসে হাসান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফরয সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে।"[৯৫] উবাই ইবনু কা'ব (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, যে ব্যক্তি সকালে আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে এবং যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল পর্যন্ত জ্বিন থেকে হেফাযতে থাকবে। হাদীসটি সহীহ।[৯৬]

মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৬১-৩৬৫, নাবাবী, আযকার, পৃ. ১১৫, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার, পৃ: ৬৫।

[৯৩] সহীহ বুখারী ১/২৮৯, নং ৮০৮, ৫/২৩৩২, নং ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম ১/৪১৪-৪১৫, নং ৫৯৩, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৪৫-৩৪৮, ৫/৩৪৯।

[৯৪] হাদীসটি হাসান। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৪৮, ১০/১০২, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৪৮।

[৯৫] হাদীসটি হাসান। হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ২/১৪৮, ১০/১০২, মুনযিরী, আত-তারগীব ২/৪৪৮।

[৯৬] তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১/২০১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৪৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫।

যিক্‌র নং ১৪: সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস ৩ বার:

উকবা ইবনু আমির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক সালাতের পরে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করতে । দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের পরে মু'আওয়িযাত, (সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন ।[৯৭]

অন্য হাদীসে এ তিনটি সূরা তিন বার করে সকালে ও সন্ধ্যায় পাঠের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মু'আয ইবনু আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "তুমি যদি সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ কর তবে তোমার আর কিছুরই দরকার হবে না ।" হাদীসটি সহীহ ।[৯৮]

এ জন্য যাকির ফজর ও মাগরিবের পরে সূরাগুলো তিনবার করে পাঠ করবেন। আর যোহর, আসর ও ইশার পরে একবার করে পাঠ করবেন ।

যিক্‌র নং ১৫: (১০০ বা ৪০০ তাসবীহ)

৩৩ সুব'হানাল্লাহ, ৩৩ আল'হামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ আল্লাহু আকবার

এ যিক্‌রগুলোর বিষয়ে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বিভিন্ন সংখ্যা বলা হয়েছে। উপরের সংখ্যাটিই বেশি প্রসিদ্ধ। সর্বোচ্চ সংখ্যা ৪০০ বার; ১০০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০০ বার "আলহামদুলিল্লাহ", ১০০ বার "আল্লাহু আকবার" এবং ১০০ বার "লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ"। সর্বনিম্ন সংখ্যা ৩০ বার; ১০ বার "সুবহানাল্লাহ", ১০ বার "আলহামদুলিল্লাহ" এবং ১০ বার "আল্লাহু আকবার" ।

যাকির প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে অন্তত ৩৩+৩৩+৩৪=১০০ বার এগুলো পাঠ করবেন। আর বিশেষ করে ফজরের এবং আসরের পরে প্রত্যেক বাক্য ১০০ বার করে মোট ৪০০ বার এগুলো জপ বা আবৃত্তি করার চেষ্টা করবেন ।

উম্মু হানী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে গিয়েছি, আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দিন যা আমি বসে বসে পালন করতে পারব। তিনি বলেন: "তুমি ১০০ বার 'সুব'হা-নাল্লাহ' বলবে, তাহলে ১০০ টি ক্রীতদাস মুক্ত করার সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল হামদু লিল্লাহ' বলবে, তাহলে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য ১০০টি সাজানো ঘোড়ায় মুজাহিদ প্রেরণের সমপরিমাণ সাওয়াব তুমি পাবে। তুমি ১০০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তাহলে ১০০ টি মাকবুল উট কুরবানির সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। তুমি ১০০ বার 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে, তাহলে তোমার

---

[৯৭] হাদীসটি হাসান। সুনানু আবী দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২৩ ।, সুনানুত তিরমিযী ৫/১৭১, নং ২৯০৩, সহীহুত তিরমিযী ২/৮, ফাতহুল বারী ৯/৬২। সুনানুন নাসাঈ ৩/৬৮, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৪৪, নং ২০০৪ ।

[৯৮] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৬৭, নং ৩৫৭৫, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮২, সাহীহুত তারগীব ১/৩৩৯ ।

সাওয়াবে আসমান ও জমিন পূর্ণ হয়ে যাবে (এবং তোমার কোনো পাপই বাকি থাকবে না) হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সনদগুলো হাসান।[৯৯]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে ও বিকালে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সে যেন একশতটি হজ্ব আদায় করল বা একশতটি উট আল্লাহর ওয়াস্তে দান করল। যে ব্যক্তি এ দু সময়ে ১০০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলল সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ১০০ টি ঘোড়ার পিঠে মুজাহিদ প্রেরণ করলো, অথবা আল্লাহর রাস্তায় ১০০ টি অভিযানে শরীক হলো। আর যে ব্যক্তি এ দু সময়ে ১০০ বার করে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করলো, সে যেন ইসমাঈল বংশের একশত ব্যক্তিকে দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করলো। আর যে ব্যক্তি এ দু সময়ে ১০০ বার করে 'আল্লাহু আকবার' বলল, ঐ দিনে তার চেয়ে বেশি আমল আর কেউ করতে পারবে না। তবে যদি কেউ তার সমান এ যিক্‌রগুলো পাঠ করে বা তার চেয়ে বেশি পাঠ করে তাহলে ভিন্ন কথা। (তাহলে সেই শুধু তার উপরে উঠতে পারবে।)

ইমাম নাসাঈর বর্ণনায় 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-র পরিবর্তে 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুআ আলা কুল্লি শাইয়্যিন কাদীর' ১০০ বার পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী ও কোনো কোনো মুহাদ্দিস হাসান বলেছেন এবং কেউ কেউ যয়ীফ বলেছেন।[১০০]

যিক্‌র নং ১৬: সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার (১ বার)

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْ لِيْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, আনতা রাব্বী, লা- ইলা-হা ইল্লা- আনতা, খালাক্বতানী, ওয়াআনা 'আবদুকা, ওয়াআনা 'আলা- 'আহদিকা ওয়াওয়া'অদিকা মাস তাতা'অতু। আ'উযু বিকা মিন শাররি মা- স্বানা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়াআবূউ লাকা বিযামবি। ফাগ্‌ফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা- আনতা।

---

[৯৯] মুসনাদ আহমদ ৬/৩৪৪, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫২, নং ৩৮১০, নাসাঈ, কুবরা ৬/২১১, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৯২; আলবানী, সাহীহাহ ৩/৩০২, ৩৯০, নং ১৩১৬।

[১০০] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১৩, আইমান সালিহ, জামিউল উসূল (টীকা) ৪/ ৩৮১; আলবানী, যায়ীফাহ ৩/৪৮০।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আপনি আমার প্রভু, আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আমি আপনার কাছে প্রদত্ত অঙ্গিকার ও প্রতিজ্ঞার উপরে রয়েছি যতটুকু পেরেছি। আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি যে কর্ম করেছি তার অকল্যাণ থেকে। আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আপনি আমাকে যত নিয়ামত দান করেছেন তা-সহ এবং আমি আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি আমার পাপ-সহ। অতএব, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না।"

শাদ্দাদ ইবনু আউস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "এ দু'আটি সাইয়্যেদুল ইস্তিগফার বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ দু'আ, যে ব্যক্তি এ দু'আর অর্থের প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রেখে দিনের বেলায় তা পাঠ করবে সে যদি ঐ দিন সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি এ দু'আর অর্থে সুদৃঢ় একীন ও বিশ্বাস রেখে রাত্রে (সন্ধ্যায়) তা পাঠ করবে, সে যদি ঐ রাতেই সকালের আগে মৃত্যুবরণ করে, তবে সে জান্নাতী হবে।"[১০১]

এখানে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, এ দু'আর ক্ষেত্রে ও মাসনূন সকল দু'আর ক্ষেত্রে দু'আর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং দু'আ পাঠের সময় অর্থের দিকে মনোযোগ দিয়ে, হৃদয়কে অর্থের সাথে সাথে আলোড়িত করে দু'আ পাঠ করলেই আমরা এ সকল দু'আর পূর্ণ ফযীলত লাভ করতে পারব। আর যদি অর্থ না বুঝি, বা অর্থ বুঝা সত্ত্বেও অর্থের দিকে মনোযোগ না দিয়ে অভ্যাসমতো মুখস্থ পড়ে যাই, তাহলে আমরা এ সকল দু'আর ফযীলত ও উপকার পুরোপুরি লাভ করতে পারব না।

যিক্‌র নং ১৭: ১০০ বার

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

উচ্চারণ : সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী।

অর্থঃ "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কেউ সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' বলে, তাহলে তার চেয়ে বেশি না বলে কেউ তার চেয়ে বেশি আমল নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হতে পারবে না।" অন্য বর্ণনায়: "ঐ ব্যক্তির গোনাহ যদি সমুদ্রের ফেনার চেয়েও বেশি হয়, তবুও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন।" কোনো কোনো বর্ণনায় যিক্‌রের শব্দটি 'সুবহা-নাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসটি সহীহ।[১০২]

---

[১০১] সহীহ বুখারী ৫/২৩২৩, নং ৫৯৪৭। জামিউল উসূল ৬/২৫৮।

[১০২] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১৪১, সুনানুত তিরমিযী ৫/৫১১, নং ৩৪৬৬,

যিক্‌র নং ১৮ : (তিন বার)

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

উচ্চারণ: সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়াবি'হামদিহী, 'আদাদা খাল্‌ক্বিহী, ওয়ারিদ্বা-নাফ্‌সিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী ওয়া মিদা-দা কালিমাতিহী ।

অর্থ: "পবিত্রতা আল্লাহর এবং প্রশংসা তাঁরই, তাঁর সৃষ্টির সম সংখ্যক, তার নিজের সন্তুষ্টি পরিমাণে, তাঁর আরশের ওজন পরিমাণে এবং তাঁর বাক্যের কালির সমপরিমাণ ।"

উম্মুল মুমিনীন জুআইরিয়্যা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পরে তাঁকে তাঁর সালাতের স্থানে যিক্‌র রত দেখে বেরিয়ে যান । এরপর তিনি অনেক বেলা হলে দুপুরের আগে ফিরে এসে দেখেন তিনি তখনও ঐ অবস্থায় তাসবিহ তাহলীলে রত রয়েছেন । তিনি বলেন: "তুমি কি আমার যাওয়ার সময় থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই যিক্‌রে রত রয়েছ?" তিনি বললেন: " হাঁ ।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "আমি তোমার কাছ থেকে বেরিয়ে চারটি বাক্য তিন বার করে বলেছি (উপরের বাক্যগুলো) । তুমি সকাল থেকে এ পর্যন্ত যত কিছু বলেছ সবকিছু একত্রে যে সাওয়াব হবে, এ বাক্যগুলোর সাওয়াব সেই একই পরিমাণ হবে ।"[১০৩]

ইমাম তিরমিযী অনুরূপ ঘটনা উম্মুল মুমিনীন সাফিয়্যাহ (রা) থেকেও বর্ণনা করেছেন । সাফিয়্যাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এসে দেখেন আমার সামনে চার হাজার বিচি রয়েছে যা দিয়ে আমি তাসবীহ বা সুবহানাল্লাহ যিক্‌র করছি । তিনি বললেন: তুমি কি এতগুলোর সব তাসবীহ পাঠ করেছ? আমি বললাম: " হাঁ ।" তখন তিনি তাকে উপরের যিক্‌রের অনুরূপ বাক্য শিখিয়ে দেন ।[১০৪]

যিক্‌র নং ১৯: দরুদ শরীফ ১০ বার

উম্মু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি সকালে দশ বার ও সন্ধ্যায় দশ বার আমার উপর সালাত পাঠ করবে, সে কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত লাভ করবে । হাদীসটি সহীহ ।"[১০৫]

সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯১, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৫৩, নং ৩৮১২, সহীহুত তারগীব ১/৩৪০-৩৪১ ।

[১০৩] সহীহ মুসলিম ৪/২০৯০-২০৯১, নং ২৭২৬, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/১১০, নাসাঈ, কুবরা ১/৪০২, ৬/৪৮, ৪৯ ।

[১০৪] সুনানুত তিরমিযী ৫/৫৫৫, নং ৩৫৫৪ । ইমাম তিরমিযী যদিও এ বর্ণনাটির দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তবে ইমাম হাকিম ও যাহাবী সাফিয়্যার হাদীসের সনদ আলোচনা করে তা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন । মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৩২ ।

[১০৫] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২০, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার, পৃ: ১৫৪ ।

মাসনূন দরুদ সম্পর্কে **এহইয়াউস সুনান** ও **রাহে বেলায়াত** গ্রন্থদ্বয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক শেখানো সর্বোত্তম দরুদ **'দরুদে ইবরাহীমী'**। সম্ভব হলে ১০ বার দরুদে ইবরাহীমী পড়বেন। তবে যে কোনো শব্দে সালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন:

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ (عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ) (النَّبِيِّ الأُمِّيِّ) وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্ম সাল্লি 'আলা- মুহাম্মাদিন ('আব্‌দিকা ওয়া রাসূলিকা) (আন-নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি) ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া আস্‌হা-বিহী ওয়া বা-রিক ওয়া সাল্লিম।

অর্থ: "হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন (আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল) (উম্মী নবী) মুহাম্মাদের উপর ও তাঁর বংশধর-অনুসারী ও সহচরগণের উপর এবং আপনি বরকত প্রদান করুন এবং সালাম প্রদান করুন।

যিক্‌র নং ২০ : (হেফাযতের দু'আ: ৩ বার)

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হিল লাযী লা- ইয়াদুর্‌রু মা'আ ইসমিহী শাইউন ফিল আরদি ওয়া লা- ফিস সামা-ই, ওয়া হুআস সামীউল 'আলীম।

অর্থ: "আল্লাহর নামে, যাঁর নামের সাথে জমিনে বা আসমানে কোনো কিছুই কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং তিনি মহাশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।"

উসমান (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে এ দু'আটি পাঠ করে তবে ঐ দিনে ও ঐ রাতে কোনো কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" হাদীসটি সহীহ।[১০৬]

যিক্‌র নং ২১: (দুশ্চিন্তা-মুক্তির দু'আ: ৭ বার)

حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

উচ্চারণ: 'হাসবিয়াল্লা-হু, লা- ইলা-হা ইল্লা- হুআ, 'আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুআ রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম।

[১০৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২৩, নং ৫০৮৮, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৬৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৫, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৭২-৩৭৭।

অর্থঃ "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আমি তাঁরই উপর নির্ভর করেছি, তিনি মহান আরশের প্রভু।"

উম্মু দারদা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় ৭ বার এ দুআটি পাঠ করবে আল্লাহ তাঁর সকল চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও সমস্যা মিটিয়ে দেবেন।" হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।[১০৭]

যিক্র নং ২২ : (আনন্দলাভের দু'আঃ ৩ বার)

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

উচ্চারণঃ রাদীতু বিল্লা-হি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলা-মি দীনান, ওয়া বিমুহাম্মাদিন নাবিয়্যান।

অর্থঃ "আল্লাহকে প্রভু হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে ও মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে নবী হিসাবে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট ও খুশি হয়েছি।"

মুনাইযির (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি সকালে এ বাক্যগুলো বলবে আমি দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তাঁর হাত ধরে তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাব।" হাইসামী হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন।[১০৮]

অন্য হাদীসে আবু সাল্লাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যদি কোনো ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় (বা সকালে ও বিকালে) এ বাক্যগুলো (৩ বার) বলে, তবে আল্লাহর উপর হক্ক (নিশ্চিত) হয়ে যায় যে, তিনি উক্ত ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট ও খুশি করবেন।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।[১০৯]

একটি সহীহ হাদীসে আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি (রাদীতু বিল্লাহি ...) বলবে তাঁর জন্য জান্নাত পাওনা হয়ে যাবে।" এ হাদীসে এ বাক্যগুলো বলার জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সর্বদা বা যে কোনো সময় আমরা এ দু'আ পাঠ করতে পারব। যাকিরের উচিত সকালে ও সন্ধ্যায় ৩ বার এবং অন্যান্য সময়ে সুযোগমত এ বাক্যগুলো বলা।[১১০]

---

[১০৭] সুনানু আবী দাউদ ৪/৩২১, নং ৫০৮১, তারগীব ১/২৫৫, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১২৭-১২৮, হিসনুল মুসলিম, পৃ. ৬১।

[১০৮] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬, যাকারিয়্যা, আল-ইখবার ফীমা লা ইয়াসিহহু, পৃঃ ১৫১।

[১০৯] মুসনাদু আহমদ ৪/৩৩৭, সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯, সুনানু ইবনু মাজাহ ২/১২৭৩, নং ৩৮৭০, বুসীরী, যাওয়াইদু ইবনি মাজাহ, পৃ. ৪৯৯, আলবানী, যয়ীফু সুনানি ইবনু মাজাহ, পৃ. ৩১৬, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৬।

[১১০] সহীহ মুসলিম ৩/১৫০১, নং ১৮৮৪, সুনানু আবী দাউদ ২/৮৭, নং ১৫২৯, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৯, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৯৮-৪০০।

যিক্‌র নং ২৩: (আল্লাহর সাহায্যলাভের দু'আ: ১বার)

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

উচ্চারণ: ইয়া- 'হাইউ ইয়া ক্বাইউমু, বিরা'হমাতিকা আস্‌তাগীসু, আস্বলি'হ্ লী শাঅ্নী কুল্লাহু, ওয়া লা- তাকিল্‌নী ইলা- নাফ্‌সী ত্বার্‌ফাতা 'আইন।

অর্থ: "হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক ও অমুখাপেক্ষী তত্ত্বাবধায়ক, আপনার রহমতের ওসীলা দিয়ে ত্রান (গাওস) প্রর্থনা করছি। আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন। আর আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না (সর্বদা আপনার তত্ত্বাবধানে আমাকে রাখুন)।"

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতেমা (রা)-কে বলেন, "আমি তোমাকে যে ওসীয়ত করছি তা গ্রহণ করতে তোমার অসুবিধা কি? আমি ওসীয়ত করছি যে, তুমি সকালে ও সন্ধ্যায় এ কথা বলবে।" হাদীসটি সহীহ।[১১১]

যিক্‌র নং ২৪ : (সকল কল্যাণ লাভের দু'আ: ১ বার)

اللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ اللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ اللّهُمَّ احْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফিদ্ দুন্‌ইয়া- ওয়াল্ আ-খিরাহ। আল্লাহুম্মা, ইন্নী আস্‌আলুকাল 'আফ্‌ওয়া ওয়াল 'আ-ফিয়্যাতা ফী দীনী ওয়া দুন্‌ইয়াই-য়া, ওয়া আহ্‌লী ওয়া মা-লী। আল্লা-হুম্মাস্-তুর 'আউরা-তী ওয়া আ-মিন রাউ'আ-তী। আল্লা-হুম্মা'হ্ ফায্‌নী মিম্ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন্ খাল্‌ফী, ওয়া 'আন্ ইয়ামীনী ওয়া 'আন্ শিমালী, ওয়া মিন্ ফাউক্বী। ওয়া আ'উযু বি'আযামাতিকা আন্ উগ্‌তা-লা মিন্ তা'হ্‌তী।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই ক্ষমা ও সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা দুনিয়াতে এবং অখিরাতে। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই ক্ষমা ও

[১১১] মুসতাদরাক হাকিম ১/৭৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১১৭, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৫।

সার্বিক সুস্থতা-নিরাপত্তা আমার দীনের মধ্যে, আমার দুনিয়াবী বিষয়ের মধ্যে, আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে ও আমার সম্পদের মধ্যে। হে আল্লাহ, আমার দোষত্রুটিগুলো গোপন করুন এবং আমার ভয়ভীতিকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাকে হেফাযত করুন আমার সামনে থেকে, আমার পিছন থেকে, আমার ডান থেকে, আমার বাম থেকে, আমার উপর থেকে এবং আমি আপনার মহত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করছি যে, আমি আমার নিু দিক থেকে আক্রান্ত হব।"

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনোই সকাল হলে ও সন্ধ্যা হলে উপরের এ কথাগুলো (উপরের দু'আটি) বলা পরিত্যাগ করতেন না (সর্বদা তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় এ দু'আটি বলতেন)। হাদীসটি সহীহ।[১১২]

এরপর যতক্ষণ সম্ভব উপরে উল্লিখিত ১ নং যিক্রটি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) বেশি বেশি করে যিকর করতে থাকবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে সকাতরে নিজের ও সকল মুসলিমের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ ও বরকত চেয়ে মুনাজাত করবেন। সকল মুসলিম মুর্দা, বিশেষত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আখিরাতের উন্নতি চেয়ে দু'আ করবেন। সম্ভব হলে সূর্যোদয়ের ২০/২৫ মিনিট পরে যিক্র সমাপ্ত করে দুই বা চার রাকাত 'চাশতের' নামায আদায় করে মসজিদ থেকে বের হবেন।

যদি চাশতের নামায পর্যন্ত বসে থাকা অসুবিধা হয়, তবে অন্তত সূর্যোদয় পর্যন্ত অথবা যতক্ষণ সম্ভব যিকরে রত থাকতে চেষ্টা করবেন। পরে সুযোগমত মসজিদে, বাড়িতে বা কর্মস্থলে যেখানে সম্ভব চাশতের নামায আদায় করেবন। আমাদের দেশে সাধারণভাবে সূর্যোদয়ের আধ-ঘন্টা আগে ফজরের জামাত শুরু হয়। এতে জামাতের পরে ১৫/২০ মিনিট যিক্র করলেই সূর্যোদয় হয়ে যায়।

আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের চারজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিক্রে রত কিছু মানুষের সাথে বসে থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার চেয়েও বেশি প্রিয়।" হাদীসটি হাসান।[১১৩] অন্য হাদীসে আবূ উমামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে বসে আল্লাহর যিক্র, তাকবীর (আল্লাহু আকবার), তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ), তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এ রত থাকা আমার কাছে ইসমাঈল (আ)-এর বংশের দুজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করার চেয়ে বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সকল যিক্রে রত থাকা আমার কাছে চারজন ক্রীতদাস মুক্ত করার

---

[১১২] মুসনাদ আহমদ ২/২৫, সুনানু ইবনি মাজাহ ২/১২৭৩, মুসতাদরাক হাকিম ১/৬৯৮, মাওয়ারিদুয যামআন ৭/৩৮১-৩৮৩, সহীহুত তারগীব ১/৩৪৩।

[১১৩] সুনানু আবী দাউদ ৩/৩২৪, নং ৩৬৬৭, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।

চেয়েও বেশি প্রিয়।" এ হাদীসটির সনদও হাসান।[১১৪]

(২) যোহরের ওযীফা

যোহরে সালাতের পরে উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্‌রগুলো পালন করবেন। অর্থাৎ:

(ক) তিন বার "আসতাগফিরুল্লাহ'

(খ) ১ বার আল্লা-হুম্মা আনতাস সালা-মু ওয়া মিনকাস সালা-মু ...

(গ) ১ বার লা- ইলা-হা ইল্লল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, ...

(ঘ) ১ বার আয়াতুল কুরসী

(ঙ) ১ বার করে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস

(চ) ৩৩ বার "সুব'হানাল্লাহ", ৩৩ বার "আল্‌'হামদুলিল্লাহ" এবং ৩৪ বার "আল্লাহু আকবার"। সম্ভব হলে ১০০ "সুবহানাল্লাহ", ১০০ "আলহামদুলিল্লাহ", ১০০ "আল্লাহু আকবার" এবং ১০০ "লা- ইলাহা ইল্লল্লাহ"।

(৩) আসরের ওযীফা

আসরের সালাতের পরেও যোহরের সালাতের ন্যায় উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্‌রগুলো পালন করবেন। এরপর সম্ভব হলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, অথবা যতক্ষণ সম্ভব যিকরের মূল চারটি বাক্য **(যিকর নং ১, ২, ৩ ও ৪)** অথবা কোনো একটি বাক্য গণনাবিহীনভাবে যিকর করতে থাকবেন। উপরের একটি হাদীসে আমরা দেখেছি যে, আসরের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এ সকল যিকরে রত থাকা অত্যন্ত ফযীলত ও সাওয়াবের কাজ। বসে থাকা সম্ভব না হলে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যে মুখে এ যিকরগুলো পড়তে থাকবেন।

(৪) মাগরিবের ওযীফা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফজর ও মাগরিবের ওযীফা একই। সালাতুল মাগরিবের পরে উপরে উল্লিখিত ৯নং থেকে ২৪নং যিক্‌রগুলো উপরের পদ্ধতিতে আদায় করবেন। এরপর যতক্ষণ সম্ভব ১ নং যিক্‌রটি (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) পালনে রত থকাবেন।

(৫) ইশার ওযীফা

ইশার সালাতের পরেও যোহরের সালাতের ন্যায় উপরে উল্লিখিত ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নং যিক্‌রগুলো পালন করবেন। উপরের যিক্‌রগুলো আদায়ের পরে (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) যিক্‌র করবেন। অন্ত ত ১০০ বার যিক্‌রটি পালন করার নিয়মিত অভ্যাস করবেন।

---

[১১৪] মুনযিরী, আত-তারগীব ১/১৭৮; আলবানী, সহীহুত তারগীব ১/২৬০।

(৬) দরুদের ওযীফা

সালাত বা দরুদ শরীফ মুমিনের অন্যতম যিকির ও হৃদয়ের সবচেয়ে বড় প্রশান্তি। রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে তাঁর উপর দরুদ ও সালামের নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং সালাত ও সালামের অতুলনীয় পুরস্কারের বর্ণনা দিয়েছেন। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, কোনো উম্মত তাঁর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করলে আল্লাহ তাকে অগণিত পুরস্কার প্রদান করেন, তার গোনাহ ক্ষমা করেন, তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন, ফিরিশতাগণ তাঁর জন্য দুআ করেন, তার সালাত ও সালাম তার নাম ও পিতার নামসহ ফিরিশতাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পৌঁছে দেন, তিনি তাঁর জন্য দুআ করেন। সর্বোপরি যে ব্যক্তি যত বেশি সালাত ও সালাম পাঠ করবে সে কিয়ামতে ততবেশী তাঁর নৈকট্য পাবে। মহান আল্লাহ অধিক পরিমাণে সালাত পাঠকারীর দুশ্চিন্তা কাটিয়ে দিবেন ও সমস্যা মিটিয়ে দিবেন।

মুমিন সর্ববাস্থায় দরুদ-সালাম পাঠ করবেন। হাটতে, চলতে, শুয়ে, বসে, কর্মব্যস্ততার ফাঁকে যে কোনো সময় সুযোগ পেলে বা খেয়াল হলে ওযু-সহ বা ওযু ছাড়া সর্বাবস্থায় দরুদ পাঠ করতে পারেন। এ ছাড়াও প্রতিদিন এক বা একাধিক সময়ে নির্ধারিত সংখ্যায় দরুদের একটি নির্ধারিত ওযীফা রাখবেন।

ফজর বাদ, আসর বাদ বা অন্য যে কোনো সময়ে দরুদের ওযীফা পালন করা যায়। তবে সুন্নাতের নির্দেশনা অনুসারে দরুদের বিশেষ সময় রাত। সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের পরে, না হলে ইশার সালাতের পরে যথাসম্ভব বেশি করে সালাত (দরুদ) পাঠ করবেন। সম্ভব হলে ৫০০ বার দরুদ পাঠ করবেন। না হলে অন্তত ১০০ বার দরুদ পাঠ করবেন। শেষে আল্লাহর দরবারে নিজের, সকল জীবিত, মৃত মুসলমান ও মুরব্বিগণের জন্য দুআ করবেন।

(৭) মুরাকাবা ও মুহাসাবা

মুরাকাবা অর্থ পর্যবেক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ (supervision/control) এবং মুহাসাবা অর্থ নিরীক্ষা বা হিসাব গ্রহণ (examination/accounting)। তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির পরিভাষায় মুরাকাবা অর্থ আত্ম-পর্যবেক্ষণ বা আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং মুহাসাবা অর্থ- আত্ম-নিরীক্ষণ বা নিজের হিসাব নিজে গ্রহণ।

মুমিনের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত নিজের কর্ম ও বিশেষ করে হৃদয়ের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও প্রতিদিন নিজের কর্ম পর্যালোচনা করা। মহান আল্লাহ বলেছেন: "হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় কর, আর প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব যে, আগামীকালের জন্য কী অগ্রীম পাঠালো তা অবলোকন-পর্যবেক্ষণ করা।"[১১৫]

[১১৫] সূরা হাশর, ১৮ আয়াত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "বুদ্ধিমান তো সে ব্যক্তি যে নিজেই নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরের জন্য কর্ম করে। আর অক্ষম তো সে ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছামত চলে আর আল্লাহর উপর অবাস্তব কামনা চাপাতে থাকে।"[১১৬]

নিজের মনের অবস্থা ও কর্মের প্রতি নিজের এ পর্যবেক্ষণ সার্বক্ষণিক হওয়া দরকার। বিশেষ করে যখনই একটু অবসর থাকবে তখন অন্য মানুষের বা সমাজের বিষয়ে অলস চিন্তা না করে নিজের কর্মের ও নিজের প্রতি আল্লাহর রহমতের চিন্তা ও পর্যালোচনা করে শুকরিয়া, দু'আ ও ইসতিগফার করা প্রয়োজন। এছাড়াও সম্ভব হলে প্রতিদিন অন্তত ৫/১০ মিনিট নির্ধারিত রাখবেন নিজের বিচার নিজে করার জন্য। তাহাজ্জুদের পরে, ইশার পরে, ঘুমানোর পূর্বে অথবা ফজরের পরে এভাবে কিছু সময় গত এক দিনের কর্ম পর্যালোচনা করবেন। এ সময়ে পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব, গত দিনের কর্ম ও হৃদয়ের অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে।

যে মানুষের পরবর্তী নিশ্বাসের নিশ্চয়তা নেই সে কী জন্য হানাহানিতে লিপ্ত হবে? কিজন্য সে লোভ করবে? সে তো পথিক। চলার পথের প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করা ও পাথেয় সংগ্রহই তো তার কাজ। চলার পথে যদি কেউ কষ্ট দেয় তাকে সম্ভব হলে ক্ষমা করে দিই না কেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তো তাকে আর দেখব না। রাস্তায়, ফেরীতে, রেলস্টেশনে বা এয়ারপোর্টে বসার চেয়ার, ট্রলি, খাবারের প্লেট, সামান্য ধাক্কাধাক্কির জন্য কি আমরা সময় নষ্ট করে মারামারিতে লিপ্ত হই? এ জীবন তো এ সকল অস্থায়ী স্থানেরই একটু বিস্তৃত রূপ। চেষ্টা করি না কেন এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ক্ষমা, ভালবাসা ও সেবায় ভরে দিতে। তাতে জীবন হবে আল্লাহর রহমতে ধন্য আর আমি অর্জন করব আখেরাতের অমূল্য পাথেয়।

পার্থিব স্বার্থপরতা বা লোভের জন্য প্রভুর নির্দেশনার বাইরে কাজ করছি? কি লাভ হবে তাতে? সে লাভ কি ভোগ করতে পারব? পারলে কতদিন। তারপর তো আমাকে প্রভুর কাছেই ফিরে যেতে হবে। অমুকের খুশির জন্য, তমুকের কাছে বড় হওয়ার জন্য, আরেকজনের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য আমি এ কাজটি করতে চাচ্ছি। কি লাভ তাতে? সে আমাকে কী দেবে? যা দেবে তা থেকে কি আমি লাভবান হতে পারব? আমাকে তো আমার প্রভুর কাছে একাকীই চলে যেতে হবে। আমার তো বাস্তববাদী হওয়া উচিত। নিজের জাগতিক ও পরকালীন জীবনের জন্য যে কাজে আমার মালিক খুশি সেই কাজই তো আমার করা উচিত।

আমি কি গত দিনে কিছু ভাল কাজ করতে পেরেছি? ওযীফা পালন করেছি? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মহব্বত ও সুন্নাতের অনুসরণে কি অগ্রসর হতে পেরেছি? পারলে আমি অন্তর দিয়ে আমার প্রতিপালকের শুকরিয়া জানাই।

---

[১১৬] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৬৩৮। তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

আমি অন্যায় ও খারাপ কাজ কি কি করেছি? আমার অন্তরে হিংসা, রাগ, লোভ ইত্যাদি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো কি এসেছিল? এগুলোর জন্য আমি আল্লাহর কাছে তাওবা করি। আমি কি কাউকে কষ্ট দিয়েছিলাম? কিভাবে তার ক্ষমা লাভ করব? কেউ কি আমাকে কষ্ট দিয়েছিল? আমি কী করেছিলাম? এখন আমি আল্লাহর কাছে তার ও আমার জন্য ক্ষমা চাইব। এ সময়ে নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা জানিয়ে আল্লাহর তাওফীক চাইতে হবে এবং মনের সকল কষ্ট ও চাওয়া-পাওয়া আল্লাহর কাছে পেশ করতে হবে।

(৮) শয়নের ওযীফা

যিক্র নং ২৫ : (১০০ তাসবীহ)

৩৩ 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ 'আল-হামদু লিল্লাহ', ৩৪ 'আল্লাহু আকবার':

ফাতেমা (রা) নিজের হাতে যাতা ঘুরিয়ে ও সংসারের সকল কর্ম একা করতে কষ্ট পেতেন। আলী (রা) তাঁকে পরামর্শ দেন যে, তোমার আব্বার নিকট যুদ্ধলব্ধ একটি দাসী চাও, যে তোমাকে সংসার কর্মে সাহায্য করবে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) -এর সাথে দেখা করতে এসে তাঁকে না পেয়ে ফিরে যান। রাত্রে তাঁরা বিছানায় শুয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছে আসেন। তিনি বলেন, "আমার আসহাবে সুফফার দরিদ্র সাহাবীগণকে বাদ দিয়ে তোমাকে কোনো দাসী দিতে পারব না। তবে দাসীর চেয়েও উত্তম বিষয় তোমাদেরকে শিখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা যখন বিছানায় শুয়ে পড়বে তখন ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।"[১১৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "কোনো মুসলিম যদি দু'টি কাজ নিয়মিত করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কাজ দু'টি খুবই সহজ কিন্তু করার মানুষ খুব কম। **(ক)** প্রত্যেক সালাতের পরে ১০ বার 'সুবহানাল্লাহ', ১০ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ১০ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এতে ১৫০ বার জিহ্বার যিক্র হবে এবং আল্লাহর কাছে আমলনামায় ১৫০০ সাওয়াব হবে। **(খ)** বিছানায় শয়ন করার পরে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে। এতে মুখে ১০০ বার ও মীযানে ১০০০ বার হবে।" রাসূলুল্লাহ ﷺ আঙ্গুলে গুণে গুণে তা দেখান। সাহাবীগণ প্রশ্ন করেন: "এ দু'টি কর্ম সহজ হওয়া সত্ত্বেও পালনকারী কম কেন?" তিনি উত্তরে বলেন : "কেউ শুয়ে পড়লে শয়তান এসে এগুলো বলার আগেই ঘুম পাড়িয়ে দেয়। সালাতের পরে এগুলো বলার আগেই তাকে তার বিভিন্ন কথা মনে করিয়ে দেয়।" হাদীসটি সহীহ।[১১৮]

---

[১১৭] সহীহ বুখারী ৩/১১৩৩, ৩/১৩৫৮, ৫/২০৫১, ৫/২৩২৯, নং ২৯৪৫, ৩৫০২, ৫০৪৬, ৫৯৫৯, সহীহ মুসলিম ৪/২০৯১, নং ২৭২৭, ফাতহুল বারী ১১/১২০।

[১১৮] সুনান আবী দাউদ ৪/৩১৬, নং ৫০৬৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৫/৩৫৪, সহীহুত তারগীব ১/৩২১-৩২২।

যিক্‌র নং ২৬ : আয়াতুল কুরসী

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস থেকে আমরা জানি যে, কেউ রাতে বিছানায় শয়ন করার পরে আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে সারারাত আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে হেফাযত করা হবে এবং কোনো শয়তান তাঁর নিকট আসতে পারবে না।[১১৯]

যিক্‌র নং ২৭ : সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত

আবু মাস'ঊদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যদি কেউ রাতে সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত পাঠ করে তবে তা তাঁর জন্য যথেষ্ট হবে।[১২০]

যিক্‌র নং ২৮ : সূরা কাফিরূন

নাওফাল আশজায়ী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, তুমি সূরা 'কাফিরূন' পড়ে ঘুমাবে, এ শির্‌ক থেকে তোমার বিমুক্তি। হাদীসটি হাসান। এ অর্থে ইবনু আব্বাস (রা) থেকে আরেকটি হাদীস হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে।[১২১]

যিক্‌র নং ২৯ : সূরা ইখলাস

আবু সাঈদ (রা) বলেন, নবীজী ﷺ তাঁর সাহাবীগণকে বললেন: তোমরা কি পারবে না রাতে কুরআনের একতৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতে? বিষয়টি তাঁদের কাছে কষ্টকর মনে হলো। তাঁরা বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে-ই বা তা পারবে? তিনি বলেন: 'কুল হুআল্লাহু আহাদ্' সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।'[১২২] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "যে ব্যক্তি ১০ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানিয়ে রাখবেন।" হাদীসটি সহীহ।[১২৩] এজন্য ঘুমানোর আগে বা অন্য কোনো সময়ে ১০ বার সূরাটি পাঠের চেষ্টা করবেন।

যিক্‌র নং ৩০: সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস একত্রে (তিন বার)

দু হাত একত্র করে এ সূরাগুলো পাঠ করে হাতে ফুঁ দিয়ে হাত দু'টি যথাসম্ভব শরীরের সর্বত্র বুলানো। এভাবে ৩ বার। আয়েশা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি রাতে বিছানায় গমনের পরে তাঁর মুবারক দু'টি হাত একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং তাতে উপরের তিনটি সূরা পাঠ করতেন। এরপর শরীরের যতটুকু সম্ভব স্থান দু হাত দিয়ে মোছেহ করতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সামনের দিক থেকে শুরু করতেন। এভাবে ৩ বার করতেন।"[১২৪]

---

[১১৯] সহীহ বুখারী ২/৮১২, ৩/১১৯৪, ৪/১৯১৪, নং ২১৮৭, ৩১০১, ৪৭২৩।

[১২০] সহীহ বুখারী ৪/১৪৭২, ১৯১৪, ১৯২৩, ১৯২৬, নং ৩৭৮৬, ৪৭২২, ৪৭৫৩, ৪৭৬৪, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৪-৫৫৫, নং ৮০৭।

[১২১] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭৪, নং ৩৪০৩, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১৩, নং ৫০৫৫, সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৭০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১২১, নাবাবী, আল-আযকার, পৃ. ১৩৯।

[১২২] সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, ৪৭২৭, সহীহ মুসলিম ১/৫৫৬, নং ৮১১।

[১২৩] মুসনাদ আহমদ ৩/৪৩৭; আলবানী, সহীহুল জামিয়িস সাগীর, ২/১১০৪, নং ৬৪৭২।

[১২৪] সহীহ বুখারী ৪/১৯১৬, নং ৪৭২৯, ৫/২১৬৫, ২১৬৯, ২১৭০।

যিক্‌র নং ৩১: ঋণমুক্তি ও সকল ক্ষতি থেকে রক্ষার দু'আ

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللّٰهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা, রাব্বাস সামা-ওয়া-তি, ওয়ারাব্বাল আরদ্বি ওয়ারাব্বাল 'আরশিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়ারাব্বা কুল্লি শাইয়িন, ফা-লিকিল হাব্বি ওয়ান নাওয়া-। ওয়া মুনযিলাত তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরকা-ন। আ'ঊযু বিকা মিন শার্‌রি কুল্লি শাইয়িন আনতা আ-খিযুম বিনা-সিয়্যাতিহী। আল্লা-হুম্মা, আনতাল আউআলু, ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাউক্বাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-তিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইকদ্বি আন্নাদ দাইনা ওয়া আগনিনা- মিনাল ফাক্বর।

অর্থ: "হে আল্লাহ, আসমানসমূহ ও জমিনের প্রভু এবং মহান আরশের প্রভু, আমাদের প্রভু এবং সবকিছুর প্রভু, যিনি অঙ্কুরিত করেন শস্য বীজ ও আঁটি, যিনি নাযিল করেছেন তাওরাত, ইঞ্জিল ও ফুরকান; আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আপনার কাছে আপনার নিয়ন্ত্রণে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই শেষ, আপনার পরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই প্রকাশ্য, আপনার উপরে আর কিছুই নেই। এবং আপনিই গোপন, আপনার নিচে আর কিছুই নেই। আপনি আমাদের ঋণমুক্ত করুন এবং আমাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে সচ্ছলতা প্রদান করুন।"

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বিছানায় শয়ন করার পরে (ডান কাতে শুয়ে) এ মুনাজাতটি পাঠ করতে শিক্ষা দিতেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ফাতিমা (রা) তাঁর কাছে খাদিমা চাইলে তিনি তাঁকে দু'আটি শিখিয়ে দেন।[১২৫]

যিক্‌র নং ৩২: ইসতিগফার ৩ বার

أَسْتَغْفِرُ اللهَ (الْعَظِيْمَ) الَّذِيْ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

[১২৫] সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৪, ন! ২৭১৩।

উচ্চারণ ও অর্থঃ (উপরের ৭ নং যিকর দেখুন)

আমরা এ বাক্যটির সাধারণ মর্যাদা আগেই জেনেছি। সাধারণভাবে সর্বদা এ যিক্‌রটি পালনীয়। ইমাম তিরমিযী আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিছানায় শয়ন করার সময় এ কথাগুলো ৩ বার বলবে আল্লাহ তাঁর গোনাহসমূহকে ক্ষমা করবেন, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমতুল্য হয়।" তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। [১২৬]

যিকর নং ৩৩: জিন-শয়তান থেকে হেফাযতের দুআ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ (التَّامَّاتِ) مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَ(مِنْ) شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

উচ্চারণঃ "আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তাম্মাতি (তাম্মা-তি) মিন 'গাদ্বাবিহী ওয়া 'ইক্বাবিহী ওয়া (মিন) শার্‌রি 'ইবাদিহী, ওয়া মিন হামাযা-তিশ শায়া-তীনি ওয়া আন ইয়া'হদুরূন।"

অর্থঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যাবলির, তাঁর গযব-ক্রোধ থেকে, তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর সৃষ্টির অকল্যাণ থেকে, শয়তানের তাড়না বা প্ররোচনা থেকে এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে।

ওয়লীদ ইবন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, আমি শয়নের সময় মনের অস্থিরতা, নানারকম চিন্তা অনুভব করি এবং ঘুমাতে পরি না। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে বিছানায় শয়ন করার পর এ দুআটি পাঠ করতে বলেন। হাদীসটি সহীহ। অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুমের সময় ভয় পেলে সে যেন এ দুআটি পাঠ করে। এ দুআ পাঠ করলে শয়তানগণ তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।" হাদীসটি হাসান। এক বর্ণনায় রাবী বলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) তাঁর সন্তানদের বুঝার মত বয়স হলেই তাদেরকে এ দুআটি শিক্ষা দিতেন। আর বুঝার মত বয়স হওয়ার আগে একটি কাগজে লিখে তাদের গলায় লটকে দিতেন।"[১২৭]

যিকর নং ৩৪: জিন, শয়তান ও ক্ষতি থেকে সংরক্ষণের দুআ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ، وَلاَ

[১২৬] সুনানুত তিরমিযী ৫/৪৭০; নববী, আল-আযকার, পৃ. ১৩৯-১৪০; আলবানী, যায়ীফুত তারগীব ১/৯০।

[১২৭] তিরমিযী ৫/৫০৬, নং ৩৫২৮; আবূ দাউদ ৪/১১; মুসনাদ আহমদ ২/১৮১, ৪/৫৭, ৬/৬; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৭৩৩; আলবানী, সাহীহাহ ১/৪৭০; সহীহুত তারগীব ২/১২০; সহীহুত তিরমিযী ৩/১৭১।

فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِيْ الأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ

উচ্চারণঃ আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লাহিত তাম্মা-তিল্লাতী লা- ইউজাওিযুহুন্না বার্‌রুন ওয়ালা- ফা-জির, মিন শার্‌রি মা- খালাক্বা ওয়া যারাআ ওয়া বারাআ, ওয়া মিন শার্‌রি মা ইয়ানযিলু মিনাস সামা-য়ি ওয়া মিন শার্‌রি মা ইয়া'অ্‌রুজু ফীহা-, ওয়া মিন শার্‌রি মা যারাআ ফিল আরদ্বি, ওয়া মিন শার্‌রি মা ইয়া'খরুজু মিন্‌হা-, ওয়া মিন শার্‌রিল্লাইলি ওয়ান নাহা-রি, ওয়া মিন শার্‌রি কুল্লি ত্বা-রিক্কিন ইল্লা- ত্বারিক্কান ইয়াত্বরুক্কু বিখাইরিন ইয়া- রা'হমা-ন ।

অর্থঃ আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যাবলির, যেগুলোকে অতিক্রম করতে পারে না কোনো পুণ্যবান বা কোনো পাপী, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন ও ছড়িয়ে দিয়েছেন তার অনিষ্ট থেকে, যা কিছু আসমান থেকে অবতরণ করে তার অনিষ্ট থেকে, যা কিছু আসমানে উঠে তার অনিষ্ট থেকে, যা কিছু যমিনে সৃষ্ট-ছড়ানো তার অনিষ্ট থেকে, যা কিছু যমিন থেকে বের হয় তার অনিষ্ট থেকে, রাত ও দিনের অনিষ্ট থেকে এবং সকল আগন্তুকের অনিষ্ট থেকে, শুধু যে আগন্তুক কল্যাণ-সহ আগমন করে সে ব্যতীত, হে মহা-দয়াময় ।"

ইবন খানবাশ (রা) বলেন, "এক রাতে শয়তান জিনগণ আগুন নিয়ে প্রান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আক্রমন করতে এগিয়ে আসে । তখন জিবরাঈল (আ) এসে তাঁকে এ দুআটি শিখিয়ে দেন । দুআটি পাঠের সাথে সাথে শয়তানদের আগুন নিভে যায় এবং তারা পালিয়ে যায় ।" অন্য হাদীসে খালিদ ইবনুল ওলীদ (রা) বলেন, "আমি রাতে প্রচণ্ড আতঙ্কিত হতাম, এমনকি তরবারি নিয়ে ছুটতাম এবং যা পেতাম তাতেই আঘাত করতাম । রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ কথা জানালে তিনি বলেন: আমাকে জিবরাঈল (আ) যে দুআ শিখিয়েছেন আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দিচ্ছি.. ।" হাদীসটি সহীহ ।[১২৮]

যিক্‌র নং ৩৫ : ঘুমের আগে সর্বশেষ মুনাজাত

اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ

[১২৮] মুসনাদ আহমদ ৩/৪১৯; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ (আসাদ সম্পাদিত) ১২/২৩৭; তাবারানী, আল-মু'জামুল আউসাত ৫/৩১৫; আলবানী, সাহীহাহ: মুখতাসারাহ (শামিলা) ২/৪৯৫, ৭/১৯৬; সহীহুত তারগীব ২/১২০ ।

وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আসলামতু নাফসী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহী ইলাইকা, ওয়াফাওআদ্বতু আমরী ইলাইকা, ওয়া আলজা'তু যাহরী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়ারাহবাতান ইলাইকা, লা- মালজাআ ওয়ালা- মানজা- মিনকা ইল্লা- ইলাইকা। আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা, ওয়াবি নাবিয়্যিকাল্লাযী আরসালতা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আমি সমর্পণ করলাম আমাকে আপনার নিকট, আমি ফেরালাম আমার মুখমণ্ডল আপনার দিকে, দায়িত্বার্পণ করলাম আপনাকে আমার যাবতীয় কর্মের, সমর্পিত করলাম আমার পৃষ্ঠকে আপনার আশ্রয়ে, আপনার প্রতি আশা ও ভয়ের সাথে। আপনার নিকট থেকে আপনি ছাড়া কোনো আশ্রয়স্থল নেই ও কোনো মুক্তির স্থান নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনি যে কিতাব নাযিল করেছেন তার উপর এবং আপনি যে নবী (ﷺ) প্রেরণ করেছেন তার উপর।"

বারা ইবনুল আযিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন, "যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। এরপর ডান কাতে শুয়ে বলবে : (উপরের বাক্যগুলো)। এ বাক্যগুলো তোমার শেষ কথা হবে (এর পরে আর কোনো কথাবার্তা বলবে না)। যে ব্যক্তি এ দু'আ পাঠের পরে সে রাত্রিতে মৃত্যুবরণ করবে সে ব্যক্তি ফিতরাতের উপরে (নিষ্পাপভাবে) মৃত্যু বরণ করবে। আর যদি বেঁচে থাকে তাহলে কল্যাণময় দিবস শুরু করবে।"[১২৯]

ওযু অবস্থায় ঘুমাতে যাওয়া

ঘুমের আগে ওযু করে সম্ভব হলে ২/৪ রাক'আত সালাত আদায় করে ঘুমাবেন। বিশেষত যারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারবেন না বলে ভয় পাবেন, তারা ঘমানোর আগে ২/৪ রাক'আত 'কিয়ামুল্লাইল' আদায় করে ঘুমাবেন।

ঘুমের জন্য ওযু অবস্থায় শয়ন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসনূন ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এ জন্য বিশেষ পুরস্কারের সুসংবাদ প্রদান করেছেন। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন: "তোমরা তোমাদের দেহগুলোকে পবিত্র রাখবে, আল্লাহ তোমাদের পাবিত্র করুন। যদি কোনো বান্দা ওযু অবস্থায় ঘুমায়, তবে তার পোশাকের মধ্যে একজন ফিরিশতা শুয়ে থাকেন। রাত্রে যখনই এ ব্যক্তি নড়াচড়া করে তখনই এ ফিরিশতা বলেন: হে আল্লাহ আপনি এ

[১২৯] সহীহ বুখারী ১/৯৭, নং ২৪৪, ৫/২৩২৬, নং ৫৯৫২, ৫/২৩২৭, নং ৫৯৫৬, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮২।

ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন, কারণ সে ওযু অবস্থায় ঘুমিয়েছে।" হাদীসটি হাসান।[১৩০]

অন্য হাদীসে মু'আয ইবনু জাবাল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "যে কোনো মুসলিম যদি ওযু অবস্থায় (আল্লাহর যিক্‌রের উপর) ঘুমায়; এরপর রাত্রে কোনো সময় হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে (ঐ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে) আল্লাহর কাছে তাঁর জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে, তবে আল্লাহ তাঁকে তাঁর প্রার্থিত বস্তু দিবেনই।"[১৩১]

ঘুমানোর সময় রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ আদায়ের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ঘুমাতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যদি কেউ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করবে বলে নিয়্যাত করে ঘুমায়, কিন্তু তার ঘুমের আধিক্যের কারণে ভোরের আগে উঠতে না পারে, তবে তাঁর নিয়্যাত অনুসারে সাওয়াব তাঁর জন্য লিখা হবে, আর তাঁর ঘুম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর জন্য দান হিসাবে গণ্য হবে।" হাদীসটি সহীহ।[১৩২]

(৯) ঘুম ভাঙার ওযীফা

যিক্‌র নং ৩৬ : রাত্রে ঘুম ভাঙার যিক্‌র

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لله وَسُبْحَانَ الله وَلا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله

উচ্চারণ: লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া'হদাহু লা- শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল 'হামদ, ওয়া হুআ 'আলা- কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর, 'আল-'হামদু লিল্লাহ', ওয়া 'সুব'হা-নাল্লা-হ', ওয়া লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, ওয়া 'আল্লা-হু আকবার', লা- 'হাওলা ওয়া লা- ক্বুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।

অর্থ: "আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সর্বোপরি ক্ষমতাবান। প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, কোনো অবলম্বন নেই, কোনো ক্ষমতা নেই আল্লাহর (সাহায্য) ছাড়া।"

উবাদা ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছে'ন, "যদি কারো রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায় অতঃপর সে উপরের যিক্‌রের বাক্যগুলো পাঠ করে এবং

---

[১৩০] সহীহ ইবনু হিব্বান ৩/৩২৮, তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/৪৬৬, সহীহুত তারগীব ১/৩১৭।

[১৩১] হাদীসটি সহীহ। নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা ৬/২০২, সুনানু আবী দাউদ ৪/৩১০, নং ৫০৪২, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/২২৩, ২২৬-২২৭, সহীহুত তারগীব ১/৩১৭।

[১৩২] সুনানুন নাসাঈ ৩/২৫৮, নং ১৭৮৭, সুনানু ইবনি মাজাহ ১/৪২৬, নং ১৩৪৪, সহীহ ইবনু খুযাইমা ২/১৯৫, মুসতাদরাক হাকিম ১/৪৫৫, সহীহুত তারগীব ১/৩১৮।

এরপর সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় অথবা কোনো প্রকার দু'আ করে বা কিছু চায় তবে তার দু'আ কবুল করা হবে। আর যদি সে এরপর উঠে ওযু করে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করে তাহলে তার সালাত কবুল করা হবে।"[১৩৩]

যিক্‌র নং ৩৭ : ভোরে ঘুম থেকে উঠার যিক্‌রঃ

اَلْحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بعْدَ مَا أماتَنَا وإِلَيْهِ النُّشُورُ

উচ্চারণ : আল-'হামদু লিল্লা-হিল লাযী আ'হইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থঃ "সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে জীবিত করেছেন মৃত্যুর (ঘুমের) পরে, আর তাঁর কাছেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) ও আবু যার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ঘুম থেকে উঠে উপরের যিক্‌রটি বলতেন।[১৩৪]

(ঘ) কয়েকটি বরকতময় মাসনূন দুআ

নিম্নে কয়েকটি সহীহ সনদে বর্ণিত মাসনূন দুআ উল্লেখ করছি। দুআগুলো সাজদার মধ্যে, দুআ মাসূরা হিসেবে, নামাজের পরে, সদাসর্বদা পাঠ করা যাবে। এ সকল দুআ ও অন্যান্য দুআ বিস্তারিত তথ্যসূত্র সহ জানতে **'রাহে বেলায়াত'** পড়ুন।

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ: دِقَّهُ وَجِلَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ ফির লী যাম্বী কুল্লাহু, দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু, ওয়া আউআলাহু ওয়া আ-খিরাহু, ওয়া 'আলা-নিয়্যাতাহু ওয়া সিররাহু।

অর্থ : "হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন পাপ।"[১৩৫]

اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আ'ইননী 'আলা- যিক্‌রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিক্‌র করতে, শুকর করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও ক্ষমতা প্রদান করুন।"[১৩৬]

---

[১৩৩] সহীহ বুখারী, ১/৩৮৭, নং ১১০৩।
[১৩৪] সহীহ বুখারী ৫/২৩৬, ২৩২৭, ২৩৩০, ৬/২৬৯২, সহীহ মুসলিম ৪/২০৮৩, নং ২৭১১।
[১৩৫] মুসলিম (৪- কিতাবুস সালাত, ৪২-বাব মা ইউকালু ফির রুকু..) ১/৩৫০ (ভারতীয় ১/১৯১)।
[১৩৬] আবূ দাউদ ২/৮৭, নং ১৫২২; মুসতাদরাক হাকিম ১/৪০৭, ৬৭৭; আলবানী, সহীহুত তারগীব ২/১১৯।

اَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ (اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ) وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, আস্বলি'হ লী দ্বীনী, (ইগ্ফির লী যান্বী) ওয়া ওয়াস্সি'য় লী ফী দা-রী ওয়া বা-রিক্ লী ফী রিযকী ।

অর্থঃ "হে আল্লাহ, আপনি আমার ধার্মিকতা সুন্দর করুন, আমার পাপ ক্ষমা করুন, আমার বাড়ি প্রশস্ত করুন এবং আমার রিযিকে বরকত দিন ।"[১৩৭]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল 'হাযানি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দিলা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল ।

অর্থঃ "হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা , দুঃখ-বেদনা, মনোকষ্ট, অক্ষমতা, অলসতা, কৃপণতা, কাপুরুষতা, ঋণের বোঝা এবং মানুষের প্রাধান্য বা প্রভাবের অধীনতা থেকে ।"[১৩৮]

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা, ইন্নী আস্আলুকাল হুদা- ওয়াত্ তুক্বা, ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল f'গিনা- ।

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমি চাচ্ছি আপনার কাছে হেদায়াত, তাকওয়া, সচ্ছলতা ও সংযম-শুদ্ধতা-শালীনতা ।[১৩৯]

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

উচ্চারণঃ ইয়া- মুক্বাল্লিবাল ক্বুলূব সা্ব্বিত ক্বাল্বী 'আলা- দীনিক্ ।

অর্থঃ হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, সুপ্রতিষ্ঠিত-স্থির রাখুন আমার হৃদয়কে আপনার দীনের উপর ।[১৪০]

---

[১৩৭] মুসনাদু আবী ইয়ালা ১৩/২৫৭, নং ৭২৭৩; হাইসামী, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১০৯ ।

[১৩৮] বুখারী (৬০-কিতাবুল জিহাদ, ৭৩-বাব মান গাযা বিসাবিয়্যিন) ৩/১০৫৯ (ভারতীয় ১/৪০৫) ।

[১৩৯] মুসলিম (৪৮-বাবুয যিকর, ১৮-বাবুত তাআওউযি মিন শাররি মা আমিলা) ৪/২০৮৭ (ভা ২/৩৫০) ।

[১৪০] তিরমিযী (৩৩-কিতাবুল কাদার, ৭-বাব.. আন্নাল কুলূব বাইনা...) ৪/৩৯০ (ভা ২/৩৬), (কিতাবুদ দাআওয়াত, ৯০-বাব) ৫/৫০৩ (ভারতীয় ২/১৯২), হাইসামী মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১০/২৭৯ ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ
ভালবাসা, সাহচর্য ও মাজলিস

(ক) আল্লাহর জন্য ভালবাসা

মহান আল্লাহর বেলায়াত অর্জনে যিকরের পাশাপাশি দুটি বিষয় অত্যন্ত সহায়কঃ (১) ভালবাসা ও (২) সাহচর্য। এগুলো মূলত নফল পর্যায়ের হলেও ফরয পর্যায়ের ঈমান, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধি অর্জনে এগুলো অত্যন্ত সহায়ক।

আল্লাহর জন্য ভালবাসার অর্থ দল, মত ইত্যাদি সকল বিবেচনা বাদ দিয়ে শুধু ঈমান ও আমল বিবেচনা করে মানুষকে ভালবাসা। আল্লাহর জন্য ভালবাসার মাপকাঠি সুন্নাতের অনুসরণ।[১৪১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসল, আল্লাহর জন্য অপছন্দ করল, আল্লাহর জন্য প্রদান করল এবং আল্লাহর জন্য দেওয়া থেকে বিরত থাকল সে ঈমানকে পরিপূর্ণ করল।" হাদীসটি সহীহ।[১৪২] এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলে, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি কিছু মানুষকে ভালবাসে, তবে আমলে তাদের সমান হতে পারে নি, তার অবস্থা কেমন হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ মানুষ যাকে ভালবেসেছে তার সাথেই তার অবস্থান।"[১৪৩]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেনঃ কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেনঃ "যারা আমার মর্যাদায় একে অপরকে ভালবাসত তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে ছায়া প্রদান করব, যে দিবসে আমার দেওয়া ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া নেই।"[১৪৪]

আল্লাহর জন্য ভালবাসা একান্তই মুমিনের নিজের আমল। এদ্বারা মুমিন নিজে লাভবান হন এবং তাঁর ঈমান গভীর হয়। যাকে ভালবাসা হলো তিনি প্রকৃতই আল্লাহর নিকট "মাকবূল" কিনা তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। প্রকাশ্য শিরক- কুফরে লিপ্ত নয় এরূপ সকল মুমিনকে ঈমানের কারণে ভালবাসতে হবে। মুমিনদের মধ্যে পাপে লিপ্তদের প্রতি পাপের পরিমাণ অনুসারে বিরক্তি থাকবে। আলিম ও বাহ্যত নেককার মানুষদেরকে দলমত নির্বিশেষে ভালবাসতে হবে। নিজের আপনজনদের চেয়েও তাদের প্রতি ঈমানী ভালবাসা মনের মধ্যে জাগরুক করতে হবে। তাদের আনন্দে খুশি ও কষ্টে ব্যথিত হতে হবে এবং সর্বদা তাদের জন্য দুআ করতে হবে।

---

[১৪১] বুখারী (৮১-কিতাবুল আদাব, ৯৬-বাবু আলামাতিল হুব্বি..) ৫/২২৮২ (ভারতীয় ২/৯১১)

[১৪২] আবূ দাউদ (কিতাবুস সুন্নাহ, বাবুদ্দলীল আলা যিয়াদাতিল ঈমান) ৪/৩৫৪ (৪৬৮৩); আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৯৪।

[১৪৩] বুখারী (৮১-কিতাবুল আদব, ৯৬- বাব আলামাতিল হুব্বি ফিল্লাহ) ৫/২২৮৩ (ভা ২/৯১১), মুসলিম (৪৫-কিতাবুল বির্‌র, ৫০-বাবুল মারয়ি মাআ মান আহাব্বা ৪/২০৩৪।

[১৪৪] মুসলিম (৪৫-কিতাবুল বির্‌র ১২-বাবরফী ফাযলিল হুব্বি ফিল্লাহ) ৪/১৯৮৮, নং ২৫৬৬ (ভা ২/৩১৭)

(খ) আল্লাহর জন্য সাহচর্য

আল্লাহর জন্য ভালবাসা হৃদয়ে নিয়ে নেককার মানুষদের সাহচর্যে সময় কাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: "তুমি মুমিন ছাড়া আর কারো সাথে মিশবে না এবং তোমার খাদ্য মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন না খায়।" হাদীসটি হাসান।[১৪৫] তিনি আরো বলেন: "বন্ধুর ধর্মই মানুষের ধর্ম; কাজেই তোমাদের কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব করলে সে যেন দেখেশুনে বিবেচনা করে তা করে।" হাদীসটি হাসান।[১৪৬]

আবু দারদা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কিছু মানুষকে উঠাবেন যাঁদের চেহারায় নূর উদ্ভাসিত থাকবে। তাঁরা মুক্তাখচিত মিম্বরের উপর থাকবে। সকল মানুষ যাঁদের নিয়ামত দেখে নিজেদের জন্য এ নিয়ামত কামনা করবে। তাঁরা নবী নন বা শহীদও নন।" তখন একজন বেদুঈন হাঁটু গেড়ে বসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তাঁদের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে বর্ণনা করুন, যেন আমরা তাঁদের চিনতে পারি। তিনি বলেন : "তাঁর সেসব মানুষ যাঁরা একে অপরকে শুধু আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, বিভিন্ন গোত্র বা গোষ্ঠী ও বিভিন্ন এলাকা বা দেশ থেকে এসে তাঁরা আল্লাহর যিক্‌রের জন্য একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিক্‌র করে।" হাদীসটি হাসান।[১৪৭] আমর ইবনু আনবাসাহ (রা) থেকে বর্ণিত এ অর্থের অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এসকল মর্যাদাপ্রাপ্ত মানুষের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "এরা হলেন বিভিন্ন গোত্র, দেশ বা এলাকা থেকে আগত মানুষ, যাঁরা আল্লাহর যিক্‌রের জন্য সমবেত হন এবং সুন্দর ও পবিত্র বাক্যসমূহ চয়ন করেন, যেমনভাবে খেজুর ভক্ষণকারী ভাল ভাল খেজুর বেছে নেয়।"[১৪৮]

(গ) যিকরের মাজলিস

নেককার মানুষদের সাহচর্যে এরূপ ভালভাল কথার মাজলিসকে 'যিকরের মাজলিস' বলা হয়। মুমিনের দায়িত্ব সকল জাগতিক মাজলিস, বৈঠক বা গল্পগুজবের মধ্যেও আল্লাহর যিকর করা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উপর দরুদ পড়া। পাশাপাশি প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব নিজের চারিপার্শে ঈমানী একটি পরিবেশ তৈরি করা। নিজের পরিবার দিয়ে শুরু করতে হবে। পরিবারের সদস্যগণ আপনার জাগতিক আনন্দ ও বেদনার সাথী। পাশাপাশি তাঁদেরকে রূহানী আনন্দ ও বেদনার সাথী বানিয়ে নিন। এতে আপনার পারিবারিক জীবন অনেক বেশি বরকতময় হবে। পরিবারের সকল সদস্য একত্রে বসে অন্তত ১০/২০ মিনিট কুরআনের কয়েকটি আয়াত তিলাওয়াত, অর্থ পাঠ ও আলোচনা

---

[১৪৫] তিরমিযী ৪/৫১৯, নং ২৩৯৫ (ভা ২/৬৫); আলবানী, সহীহুত তারগীব ৩/৯৫।
[১৪৬] তিরমিযী (৩৭-যুহদ, ৪৫-বাব) ৪/৫৮৯, নং ২৩৭৮ (ভারতীয় ২/৬৩)
[১৪৭] মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭, আত-তারগীব ২/৩৮৩।
[১৪৮] আত-তারগীব ২/৩৮৮-৩৮৯, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৭। সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য।

করুন। সম্ভব হলে এর সাথে 'রিয়াদুস্‌সালিহীন' জাতীয় গ্রন্থ থেকে একটি হাদীস অর্থসহ পাঠ করুন। শিশু-কিশোরদের অবশ্যই এতে শরীক করবেন। শিশু-কিশোররা যখন অনুভব করে যে, মাত্র ১০/১৫ মিনিটে মাজলিস শেষ হবে তখন তারা তাদের খেলাধুলা বা কার্টুন রেখে মাজলিসে বসতে আপত্তি বোধ করে না। পাশাপাশি প্রতি সপ্তাহে বা অন্তত প্রতি মাসে একবার বাড়িতে কোনো আলিমকে এনে যিকরের মাজলিস প্রতিষ্ঠা করবেন। মহল্লা, শহর বা দেশের যে কোনো পর্যায়ের যিকরের মাজলিসে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একত্রে অংশগ্রহণের চেষ্টা করবেন। এছাড়া সুযোগ থাকলে রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, ভিডিও ইত্যাদিতে ইসলামী অনুষ্ঠানগুলো পরিবারের সকলকে নিয়ে একত্রে উপভোগের অভ্যাস করুন।

সম্মানিত পাঠক, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এরূপ মাজলিস প্রথম দৃষ্টিতে অসম্ভব বা কষ্টকর মনে হতে পারে। কেউ হয়ত কথা শুনবে না বলে মনে হতে পারে। এগুলো সবই শয়তানী ওয়াসওয়াসা। সকল দ্বিধা এড়িয়ে শুরু করুন। দেখবেন তা খুবই সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে। অন্যান্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ইলমী বা দাওয়াতী ব্যস্ততা থেকে সময় কাটছাট করে পরিবারের সাথে এরূপ মাজলিসের জন্য অধিক পরিমাণ সময় নির্ধারণ করুন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আপনার মহল্লায় বসবাসরত বাহ্যত মুত্তাকী মুমিনদের সাথে ঈমানী বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন। রাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক মত এবং সামাজিক অবস্থান বিচার করবেন না। অন্তত কয়েকজন ভিন্ন মতের এবং দরিদ্র বা সামাজিক বিচারে উপেক্ষিত বাহ্যিকভাবে মুত্তাকী-নামাযী মানুষদের সাথে ঈমানী বন্ধুত্ব গড়ে তুলুন, তাদের সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করুন এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক মাজলিস করে কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত, অর্থ, ও দীনী আলোচনায় সময় কাটান। এ ধরনের মাজলিসে সম্ভব হলে পর্দা-সহ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে মনোযোগী হোন।

সর্বোপরি নিকটে বা দূরে অবস্থানরত সুন্নাতের অনুসারী আলিম, শাইখ বা বুজুর্গদের নিয়মিত সাহচর্য গ্রহণের চেষ্টা করুন।

এরূপ মাজলিসের ফযীলত অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত। এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি। আবু হুরাইরা (রা) ও আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "যখনই কোনো সম্প্রদায় (কিছু মানুষ) বসে মহা মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণ (যিক্‌র) করে, তখনই ফিরিশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন, রহমত তাদেরকে আবৃত করে, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাদের স্মরণ (যিক্‌র) করেন তাঁর (আল্লাহর) নিকট যারা আছেন তাদের মধ্যে।"[১৪৯] অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা) বলেন, আমি বললাম, হে

[১৪৯] সহীহ মুসলিম ৪/২০৭৪, নং ২৭০০।

আল্লাহর রাসূল, যিক্‌রের মাজলিসের গনীমত (লাভ) কী ? তিনি বলেন : "যিক্‌রের মাজলিসসমূহের গনীমত বা লাভ জান্নাত।" হাদীসটির সনদ হাসান।[১৫০]

প্রখ্যাত তাবেয়ী আতা ইবনু আবী মুসলিম খুরাসানী (৫০-১৩৫ হি) বলেন: "যিক্‌রের মাজলিস হালাল হারাম আলোচনার মাজলিস। কিভাবে বেচাকেনা করবে, কিভাবে ব্যবসা করবে, কিভাবে সালাত আদায় করবে, কিভাবে সিয়াম পালন করবে, কিভাবে বিবাহ করবে, কিভাবে তালাক দিবে, কিভাবে হজ্ব পালন করবে এবং অনুরূপ সকল বিষয় আলোচনার মাজলিসই যিক্‌রের মাজলিস।"[১৫১]

(ঘ) যিকিরের মাজলিসের যিক্‌র

হাদীস থেকে আমরা জানাতে পারি যে, যিকিরের মাজলিস মূলত ঈমান ও ইল্‌ম বৃদ্ধির মাজলিস। এ মাজলিসের মূল হলো আলোচনা ও ওয়ায। আমরা সাধারণত মনে করি যে, যিকিরের মাজলিস অর্থ একাকী পালনীয় যিকির আযকারগুলো একত্রে পালন করার মাজলিস। ধারণাটি ভুল ও সুন্নাতের খেলাফ।

যিকির মূলত দুই প্রকার: **(ক)** স্মরণ করা এবং **(খ)** স্মরণ করানো। যিকিরের মাজলিসের অন্যতম প্রধান যিকির হলো স্মরণ করানো বা ওয়ায আলোচনা। আমাদের বুঝতে হবে যে, তাসবীহ, তাহলীল ইত্যাদি যিকির মুমিন একাকী পালন করতে পারেন। কিন্তু ইল্‌ম, তাকওয়া ও আল্লাহর পথে চলার আগ্রহ বৃদ্ধিমূলক আলোচনা একা করা যায় না বা করতে অসুবিধা। যিকিরের মাজলিসে এ বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। এসকল আলোচনা, দোয়া ইত্যাদির মধ্যে আলোচনার আবেগ ও প্রেরণা অনুসারে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, সালাত, সালাম ইত্যাদি মাসনূন যিকির মাসনূন পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে।

হাদীস শরীফে বিশেষভাবে যিকিরের মাজলিসে নিম্নের যিকিরগুলো পালনের কথা বলা হয়েছে : ১) কুরআন তিলওয়াত, শিক্ষা ও অর্থ আলোচনা, ২) ঈমান ও তাকওয়া উদ্দীপক ওয়ায, ৩) আল্লাহর নিয়ামতের আলোচনা করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, ৪) তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ ও দরুদ পাঠ করা, ৫) দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ ও জান্নাত প্রার্থনা করা এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা, ১১) ইস্তিগফার করা বা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(ঙ) দরবারে ফুরফুরার তালিমী মাহফিল

মাসনূন পদ্ধতিতে যিকরের মাজলিস কায়েম করার জন্য ফুরফুরার পীর শাইখুল ইসলাম আবুল আনসার সিদ্দীকী (রাহ) 'জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ' সংগঠনের আওতায় সাপ্তাহিক, মাসিক বা ত্রৈয়মাসিক 'তালিমী' মাহফিলের ব্যবস্থা করেন। সর্বশেষ গত ১৩/০৭/০৫ তারিখে দারুস সালাম 'জমিয়তুল মুসলিমীন

[১৫০] মুসনাদ আহমদ ২/১৭৭, ১৯০, আত-তারগীব ২/৩৮১, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/৭৮।

[১৫১] আবু নুআইম, হিলউয়াতুল আউলিয়া ৫/১৯৫, নাবাবী, আযকার, পৃ. ৩০, যাহাবী, আ'লামিন নুবালা ৬/১৪২।

হিযবুল্লাহ'-র মুবাল্লিগ সম্মেলনে মুবাল্লিগদের উদ্দেশ্যে লিখিত নসীহতে তিনি এ বিষয়ক মূলনীতি ও নেসাব ঘোষণা করেন। উক্ত লিখিত নসীহতে তিনি বলেন:

"প্রিয় মুবাল্লিগ ভায়েরা, আস-সালামু আলাইকুম। ... ফুরফুরা নতুন কোনো কথাও শিখাচ্ছে না, নতুন কোনো কাজও আপনাকে দিচ্ছে না। কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়েছে পরস্পরকে সত্যের তাকীদ ও উপদেশ দিতে।.. রাসূলগণের দায়িত্বই ছিল 'বালাগুল মুবীন' বা সুস্পষ্ট প্রচার।... বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন ইসলামের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য। সুতরাং আপনারা সেই মূল হুকুম অনুসারে মুবাল্লিগ হচ্ছেন।

ফুরফুরার পীর সাহেবের বা কোনো বুজুর্গের কারামত বর্ণনা, তাবিজ দেওয়া, ঝাড়ফুঁক করা, খেলাফত লাভ করে পীর হয়ে বসা এগুলো আপনাদের দায়িত্ব নয়। আপনার আকীদা সঠিক হলে, আমল সুন্নাত মোতাবেক হলে, আপনি বেলায়াতের যোগ্য হলে, আপনি ওলী হয়ে যাবেন, সেটা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। সুতরাং আপনারা নিজেরা কুরআন পড়ে ও প্রয়োজনে বাংলা অনুবাদ পড়ে বুঝবেন, হাদীসে রাসূল (ﷺ)-এর অনুবাদ পড়ে বুঝবেন, নিজেরা আমল করবেন এবং সেই অনুযায়ী নসীহত করবেন। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, "ওহে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা কেনো তা বলো যা তোমরা করো না? আল্লহর কাছে খুবই নিন্দনীয় যে, তোমরা যা বলো তা করো না।" (সূরা আস-সাফ্ফ: ২-৩) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মেরাজে গিয়ে দেখেছেন, আগুনের কাঁচি দিয়ে তাদেরই ঠোঁট কাটা হচ্ছে যারা নসীহত করতো কিন্তু নিজেরা আমল করতো না। আপনাদের কাজ সহজ হবে যদি আপনারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জাত ও সেফাত সম্পর্কে আলোচনা করেন, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর সুন্নাত সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেজন্য বিদআতের পরিচয় ভালোভাবে জানা দরকার। আমাদের প্রকাশিত কিতাব 'এহইয়াউস সুনান' এ বিষয়ে সুলিখিত ও গবেষণামূলক। মাওলানা ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর এই কিতাবের লেখক হিসেবে স্বর্ণ পদক পেয়েছেন। তাঁর আরো কিতাব আছে, যেমন 'রাহে বেলায়াত', 'ওযীফায়ে রাসূল (ﷺ)', 'আল্লাহর পথে দাওয়াত', 'ইসলামে পর্দা' ইত্যাদি। কিতাবগুলো সংগ্রহ করে পড়বেন। ... . আমি বলে থাকি, "আমার নিজস্ব কোনো মত নেই, কুরআন ও সুন্নাহ যা বলে সেটাই আমার মত।" এ কারণেই পূর্বেও জায়েয জানতান, এখনো জায়েয জানি, কিন্তু সুন্নাত সম্মত নয় বলে আমি কিয়াম করা পছন্দ করি না। ... আমার পিতা ফুরফুরার পীর বড় হুজুর আব্দুল হাই (রাহ)-কে দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাছে থেকে দেখেছি এবং আমার মতো তাঁকে বুঝবার এবং তাঁর কাছে থেকে তালিম-তাওয়াজ্জুহ নেবার সুযোগ কে পেয়েছে? আবার তিনি মোজাদ্দেদে জামান আবূ বকর সিদ্দিকী (রাহ)-এর কাছে যা কিছু শিখেছেন আমাকে তা শিখিয়ে গেছেন। তাঁরা উভয়েই বড় বড় কাজ করেছেন। সমাজের বহু শিরক বিদআতকে তাড়াতে গিয়ে জায়েয কিছু বিদ'আতকে তাঁরা গুরুত্বহীনভাবে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

মাওলানা রুহুল আমীন (রাহ) তাঁর লেখা মোজাদ্দেদে জামান (রাহ)-এর বিস্তারিত জীবনী গ্রন্থে তাঁর ওসিয়তনামা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ... যেমন "ফুরফুরার খলিফা ও মুরিদের কেহ কুরআন, হাদীস ও ফেকহসমূহের বিপরীত চললে কেহ যেন না মানেন। (১০ নং ওসীয়ত)। .... এলমে-গায়েব আল্লাহ তায়ালা হযরত নবী (ﷺ)-কে যতদূর জানাইয়া দিয়াছেন, ততদূর জানেন। গায়েবের মালিক আল্লাহ তায়ালা, এইরূপ আকীদা রখিবেন। হযরত (ﷺ) যে গায়েব জানেন, সেই গায়েবকে এলমে-হুসূলি বলে। (৩৫ নং ওসীয়ত) .... আমার খলীফা ও মুরীদগণের মধ্যে হাজার হজার আলেম আছেন, যারা বহু কিতাব লিখেছেন, ওই সব কিতাবের শরীয়তের খেলাফ কথা কেউ মানবেন না... (৪২ নয় ওসিয়ত)। সুতরাং আমরা, অর্থাৎ আমার পূর্ববর্তী ফুরফুরার দুইজন পীর এবং আমি এক নীতিতে আছি। একজন মুবাল্লিগ নিজে সংশোধন হবেন কেবল তাই নয়, তাঁর দ্বারা সমাজও হেদায়েতের দিশা পাবে। সুতরাং ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যাদের উদ্দেশ্যে নসীহত করা হচ্ছে তাদের প্রতি সম্মান ও দরদ উভয়টিই জরুরী। যে কোনো মুসলমানের ধন ও সম্মান অন্য মুসলানেরর কাছে নিরাপদ আমানতের তুল্য। কেবল ফুরফুরার পীরই হক ছিলেন এমন জাহালতি ধারণা করবেন না। ..... যে কোনো মাযহাব পন্থী, এমনকি লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস, তাবলীগ জামাত, জামায়াতে ইসলামী, দেওবন্দী এরা সকলেই যার যার সাধ্যমতো কাজ করে যাচ্ছে। তাদের কাউকে মন্দ জানবেন না এবং পারস্পরিক বিভেদ সৃষ্টির কোনো কাজ করবেন না। সকল মুসলমান মিলেই সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু কুরআনকে মজবুতভাবে ধরে রাখতে এবং পরস্পরে বিভেদ না করতে আল্লাহ হুকুম করেছেন। (সূরা আল-ইমরান: ১০৩)

ফুরফুরার জমিয়তুল মুসলিমীন হিযবুল্লাহ সংগঠনের জন্য তালিমী নিসাব

তালিমী মাহফিলকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করবেন। প্রথম পর্যায়ে যিকরের তালিম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্যান্য আমলের তালিম। প্রথম পর্যায়ে কমবেশি আধাঘন্টা যিকরের তালিম দিবেন। সকল প্রকার যিকর-তালিম যথাসম্ভব মৃদু শব্দে, বিনয় ও ভয়ের সথে পালন করবেন। প্রত্যেকে মৃদু শব্দে যিকরের সময় বিনয় ও ভয় সহকারে নিজের মধ্যে হালত সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।

প্রথম পর্যায়:

(১) সালাতুল মাগরিবের পরে সকলেই দুই রাক'আত করে ৬ রাকআত নফল সালাত (সালাতুল আওয়াবীন নামে পরিচিত) আদায় করবেন।

(২) এরপর একবার সাইয়েদুল ইসতিগফার এবং তিন বার 'আসতাগফিরুল্লা হাল আযীম .... আতূবু ইলাইহি পাঠ করবেন। তালিম পরিচালনাকারী এগুলোর অর্থ আলোচনা করে সকলের মনের মধ্যে তাওবার আবেগ সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। এরপর আরো কিছুক্ষণ সাধারণভাবে ইসতিগফার করবেন।

(৩) ৩ বার সূরা ফাতিহা, ১০ বার সূরা ইখলাস ও ১০ বার দরুদ শরীফ

(দরুদে ইবরাহীমী) পাঠ করে মুনাজাত করবেন।

(৪) আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার (৭ বার) পাঠ করবেন।

(৫) এরপর তালিম দানকারী বা মুবাল্লিগ আদবের সাথে নিম্নের যিক্‌রগুলো পাঠ করবেন। উপস্থিত প্রত্যেকে মাসনূন আদবের সাথে নিঃশব্দে বা মৃদু শব্দে পাঠ করবেন। তালিমদানকারী ব্যক্তি যিকরের অর্থের কথা মাঝে মাঝে উল্লেখ করে সকলের মনের মধ্যে হালত তৈরির চেষ্টা করবন:

(ক) সুবহানাল্লাহ: (৩৩ বার অথবা ১০০ বার)

(খ) আল-হামদু ল্লিাহ: (৩৩ বার অথবা ১০০ বার)

(গ) আল্লাহু আকবার: (৩৪ বার অথবা ১০০ বার)

(ঘ) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু: (১০০ বার অথবা বেশি)

(চ) লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ: সুযোগমত কয়েকবার

(ঙ) سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْم

উচ্চারণ:সুব'হা-নাল্লা-হি ওয়া বি'হামদিহী সুব'হা-নাল্লা-হিল 'আযীম।

অর্থ: "আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা (প্রশংসাময় পবিত্রতা) ঘোষণা করছি মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি। (সুযোগমত কয়েকবার)

(৬) এরপর সম্ভব হলে কিছুক্ষণ প্রত্যেকে নিঃশব্দে বা মৃদুশব্দে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' যিকর করবেন।

(৭) এরপর তাওবার সবক পালন করবেন এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ গোনাহের কথা স্মরণ করে আবেগের সাথে বেশি বেশি তাওবা ইসতিগফার করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়:

কমবেশি আধাঘন্টা থেকে এক ঘন্টা ইলম-আমলের তালিম দিবেন। প্রথম পর্যায়ের শেষে মুবাল্লিগ, তালিমদানকারী ব্যক্তি বা অন্য কেউ নিম্নের কিতাবগুলো থেকে নিয়মিত পাঠ করবেন। সময় ও সুযোগ মত অল্প বা বেশি করতে পারেন। এ সকল বইয়ের বাইরে কোনো ওয়ায বা গল্পে সময় নষ্ট করবেন না।

(ক) তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন থেকে অনুবাদ পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

(খ) রিয়াদুস সালিহীন থেকে বাংলা অনুবাদ হাদীস পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

(গ) এহইয়াউস সুনান থেকে নিয়মিত পাঠ (কম বেশি ১০ মি)

(ঘ) ইবাদাতুল মু'মিনীনের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে নিয়মিত পাঠ (কমবেশি ১০ মি)

মাহফিল শেষে মুবাল্লিগ বা মাহফিল পরিচালনাকারী ব্যক্তি সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে দৈনন্দিন সবক পূর্ণ করার উৎসাহ প্রদান করবেন।

وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين